সোনালী মাছের দেখা পেলে বুড়ো জেলে আবার মাফ চেয়ে নিল। বলল, সোনালী মাছ, বুড়ি বলছে, তার মত জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী মহিলা রাণী হওয়া উচিত। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, তবে আমাকে রেহাই দাও!.....

সোনালী মাছ বলল, ভয় নেই, আমি তার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি।

বুড়ো এবার বাড়ি গিয়ে দেখল বুড়ি আগের সেই ভাঙ্গাচোড়া কুড়ে ঘরে বসে আছে।

৪৪১। সোনালী মাছ

জেলে বুড়ো হয়ে গেছে। তার হাতে এক পয়সাও নেই, সে দিনে আনে দিনে খায়। জেলের বউও বুড়ি হয়ে গেছে। সারাদিন সে তার ভাগ্যের দূর্নাম করে।

একদিন বুড়ি কাপড় কেচে ঘরে ফিরে এলে হঠাৎ দেখতে পেল ঘরের চালে আর কোন ছিদ্র নেই। চাল নতুন গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। বলল, কই, বুড়োকে এ কাজ করতে দেখিনি তো...? তারপর রান্না করতে গিয়ে দেখে হাড়িভরা গরম ভাত, আর কড়াইতে বড় একটা ভাজা মাছ। বুড়ির চোখ কপালে উঠল। এমন সময় জেলের নৌকো ঘাটে ভিড়ল। সে এসে বলল, আজ কিছু পেলাম না, সমুদ্রে যা বাতাস! আজ না খেয়ে থাকতে হবে বুঝি। বুড়ি বলল, কেন, এই

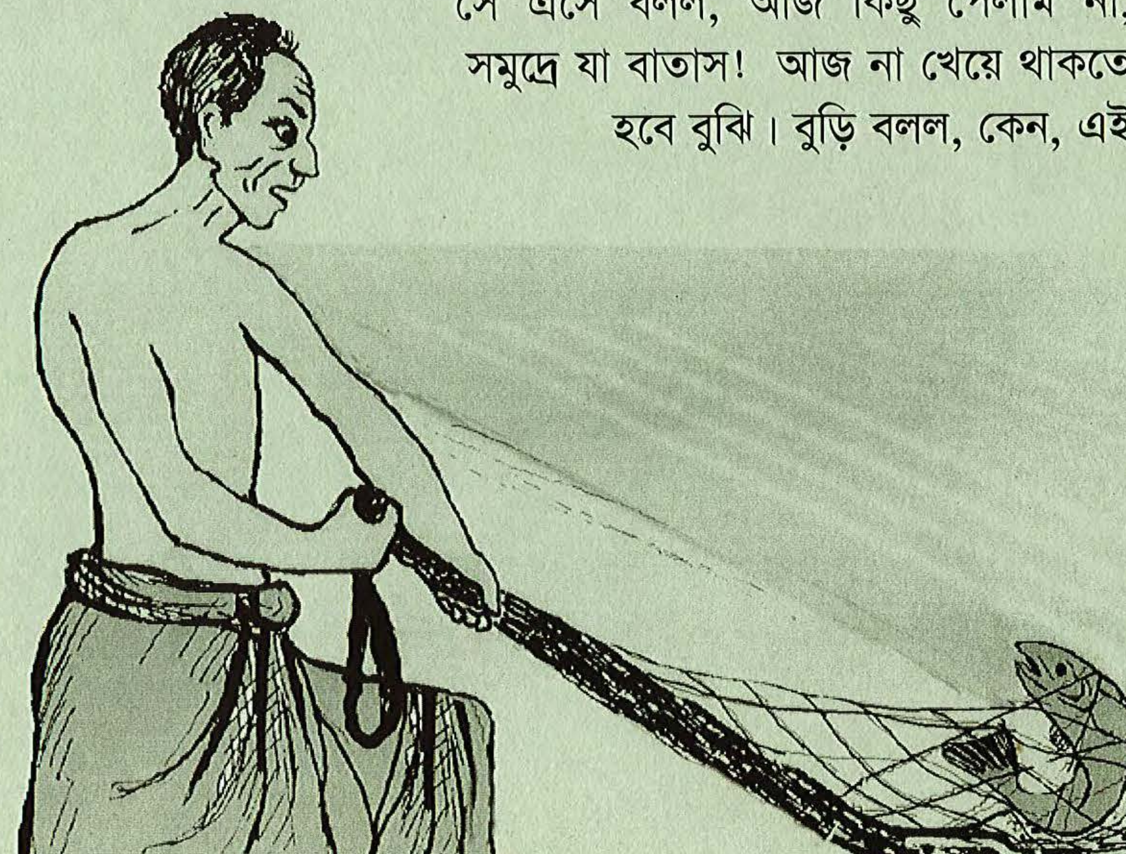

বড় মাছ আর এই গরম ভাত কে খাবে তাহলে ? বুড়ো অবাক হয়ে গেল। তারপর খেতে খেতে বলল, বুঝেছি। এক সোনালী মাছ ধরেছিলাম। মাছটা আমাকে খুব অনুনয় বিনয় করল, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি চাই ? আমি বললাম, কিছু না, মাথার উপর একটা চাল থাকলে আর হাড়িতে চারটি ভাত হলে আমার আর কিছু দরকার হয় না। বুড়ি বলল, তাই সোনালী মাছটা এসব দিল বুঝি? তোমার মত বোকা মানুষকে বিয়ে করে আমি নিজের সর্বনাশ করেছি। ঐ দেখ, তোমার ঘরের চাল নতুন হয়ে গেছে, কিন্তু গোলপাতা ছিল, গোলপাতাই রইল। বোকা কোথাকার, একটা দালান চাইলে না কেন ?

সেদিন থেকে রোজ বুড়ি তাকে জ্বালাতন করতে লাগল। আর সহ্য

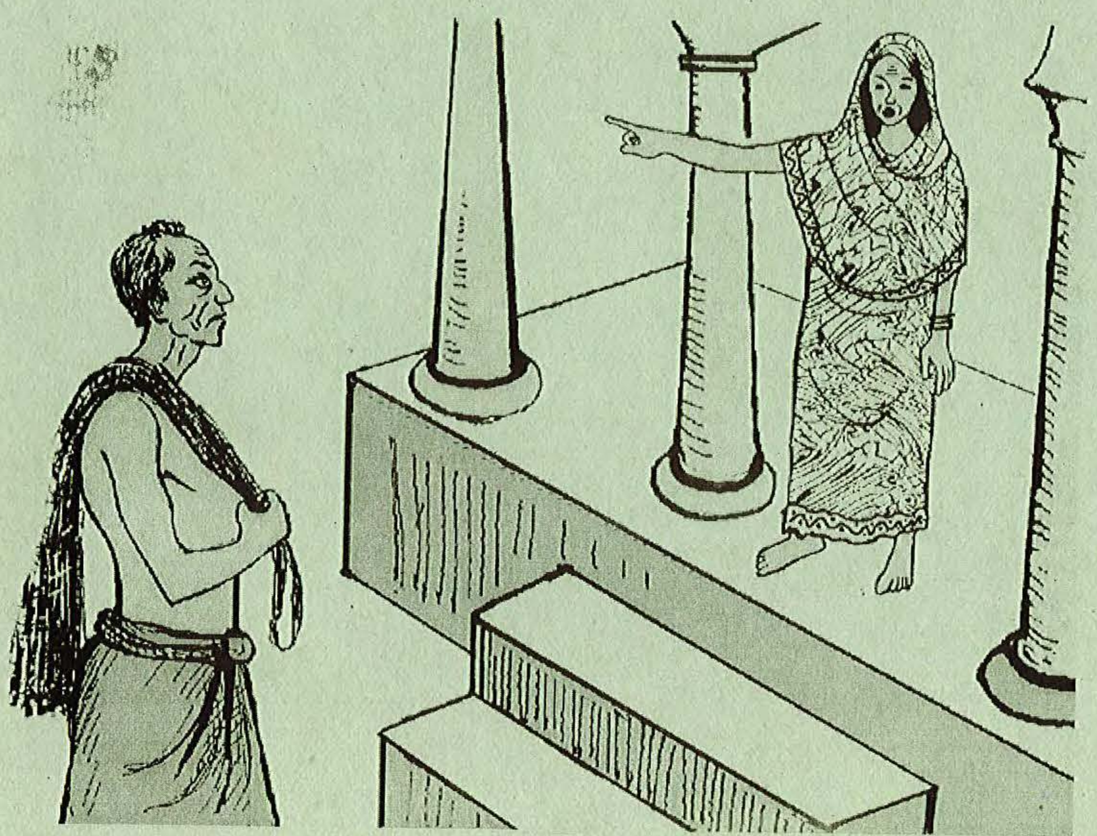

করতে না পেরে একদিন সমুদ্রে গিয়ে বুড়ো জেলে ডাক দিল, সোনালী মাছ, সোনালী মাছ ! বুড়ি আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। তার একটা দালান চাই।

বাড়ি ফিরে এসে বুড়ো জেলে দেখে দোতালা দালানে বসে বুড়ি বক বক করছে, আমি তোমাকে বলিনি, তোমার মাথায় এতটুকু ঘিলু নেই ? থাকলে কি আমাদের এই বুড়ো বয়সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাঁচতে হয় ? আচ্ছা, চারটি চাকর, গাড়িঘোড়া, পাঁচশ বিঘে জমি চাইলে তোমার জিব খসে পড়ত বুঝি?... না, তোমার ঘর করার চেয়ে এক ফকিরের ঘর করা আমার ভাল ছিল।

সেদিন থেকে বুড়ো জেলে ঘরে ফিরে আসতে ভয় করে। বুড়ি হরতাল ঘোষণা করেছে। রান্না করে না, ভাত দেয় না, কাপড় কাচে না, শুধু খায় আর শুয়ে থাকে। শেষে বুড়ো আর সহ্য করতে পারল না। আবার সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে ডাকল, সোনালী মাছ, সোনালী মাছ, আমাকে মাফ করে দাও, এবার বুড়িকে গাড়িঘোড়া, জমিজমা না দিলে আমাকে না খাইয়ে মারবে।

সোনালী মাছ এসে বলল, কিছু ভেব না, আমি ব্যবস্থা করছি।

এবার যখন বাড়ি গেল তখন বুড়োকে আর ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল না। চাকর-বাকর তার ময়লা কাপড় দেখে তাকে তাড়িয়ে দিল। তেতলা থেকে বুড়ি চিৎকার করে বলল, আমার মত বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী মহিলার এই দেশের রাণী হওয়া উচিত ছিল, তোমার মাথায় খেয়াল হল না বুঝি? যাও, এই দেশের রাণী না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে এই ঘরে ঢুকতে দেব না।

এবার বাড়ী যাও, দিদি, দেরী হয়ে গেছে, তোমার মা বকবে।
চম্পা চুপে চুপে বাড়ী গেল।
মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এতক্ষণ দাদুর কাছে কি করলে মা ?
- দাদুকে সাহায্য করেছি।
- তাকে কি সাহায্য করেছ মা ?

দাদু একা একা কাঁদতে পারছিল না। আমি যাওয়াতে দাদু খুব কেঁদেছে.....

৪৪২। চম্পা

চম্পা সব সময় পাশের বাড়ী যায়। পাশের বাড়ীতে তার সমবয়সী আর একটা মেয়ে আছে, ফুলমালা তার নাম। তার সঙ্গে চম্পা প্রতিদিন কুত কুত খেলা করে। তারপর বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ী আসার আগে কিন্তু

চম্পা ফুলমালার দাদুর সঙ্গে খেলতে যায়। দাদু উঠানে একটা চৌকিতে বসে। চম্পা তার চারদিকে একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ তার শক্তিতে কুলায়। দাদু আঙ্গুল গুনে হিসাব রাখে কয় পাক হয়েছে। কোন কোন দিন হাতের আঙ্গুল হিসাবে কুলায় না, তখন চম্পা তার পায়ের আঙ্গুল দেখিয়ে গুণতে বলে। দাদু তার চৌকিতে বসে চেয়ে দেখে চম্পার মুখের হাসি। দাদু ভাবে, পাঁচ বছরের একটা মেয়ে যখন হাসে, তখন মুখ গোমড়া করে রাখে কার সাধ্য ?

একদিন কিন্তু ফুলমালা ও তার বাবা-মা টাউনে চলে গেল। দাদু আর দাদী বাড়ীতে থেকে গেল। এখন চম্পা যখন তাদের বাড়ীতে যায়, তখন কেউ হৈ চৈ করে না , কেউ কথা বলে না। কুত কুত খেলার দাগগুলো দিনের পর দিন একই রকম থেকে যায়। দাদী যখন উঠান লেপে , তখন সব সময় আবার সেই দাগ কেটে রাখে। বারান্দার কোণায় সব সময় সেই পাঁচটা গুটি রেখে দেয়। চম্পা সকাল বিকাল দু'বেলা আসে। একবার গুটি ও কুত কুত খেলা শেষ করে বিরক্ত হয়ে

যায়, তখন দাদু-দাদীর চারপাশে লাফিয়ে ঘুরতে থাকে। তাদের গুণতে হবে কয় পাক হয়। আগে গুনবে দাদু , পরে গুনবে দাদী। চম্পা তাদের শিখিয়ে দিয়েছে কেমন করে গুনতে হয়। তারপর চম্পা দাদীর কাছ থেকে মুড়ি খায়। গুনে গুনে মুড়ি খায়। এক কুড়ি মুড়ি খায়। বেশি খিদে লাগলে দু'কুড়ি খায়। শেষে জিজ্ঞাসা করে, ফুলমালা আসবে কবে ? তারা উত্তর দেয়, আগামী সপ্তা। তখন চম্পা হাসতে হাসতে বাড়ী যায়। একদিন ভোরে মা চম্পাকে জাগিয়ে দিল।

• চল, দাদীর কাছে যাবে।

• কেন ? এখনও সূর্য ওঠেনি।

• দাদীর অসুখ করেছে, তোমাকে ডাকছে।

• কেন তার অসুখ করেছে?

• জানি না, মা। দাদী তোমাকে দেখতে চায়, চল।

চম্পা দৌড়াল। দাদী বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিল, তার দু'চোখ বন্ধ। চম্পা ডাকল,

• দাদী ! দাদী ! চোখ খোল। তোমার কি হয়েছে ? উঠবে না ?

দাদী চোখ খুলল। দাদী অনেক কষ্টে চোখ খুলল। চোখে তার মৃদু হাসি ফুটল। দাদুর দিকে চেয়ে বলল, মুড়ি।

দাদু বুঝতে পালল। আলমারি থেকে মুড়ির ঠোঙা বের করে চম্পাকে দিল।

• খাও দিদি, দাদী তোমার মুড়ি খাওয়া দেখতে চায়। শুরু কর, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ.......

• কি হয়েছে দাদু ? আর তুমি গুনছ না কেন দাদী ?

• তোমার দাদী আর গুণতে পারবে না মা, তোমার দাদী মারা গেছে। সারারাত তোমার অপেক্ষায় ছিল। তোমার মুখ না দেখে মরতে চায়নি।

জানাজা পড়তে, কবর দিতে, সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে এসে চম্পা বলল, আম্মু, দাদুর কাছে একটু যাই ?

• যাও মা, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এস, রাত হয়ে গেছে।

চম্পা চুপি চুপি দাদুর কাছে গেল। দাদু উঠানে তার সেই চৌখিতে বসে পড়ল, কিছু বলল না।

দাদু সারাদিন কাঁদেনি। এবার তার দু চোখ দিয়ে পানি ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ চম্পা তার কোলে বসে রইল। শেষের দাদু বলল,

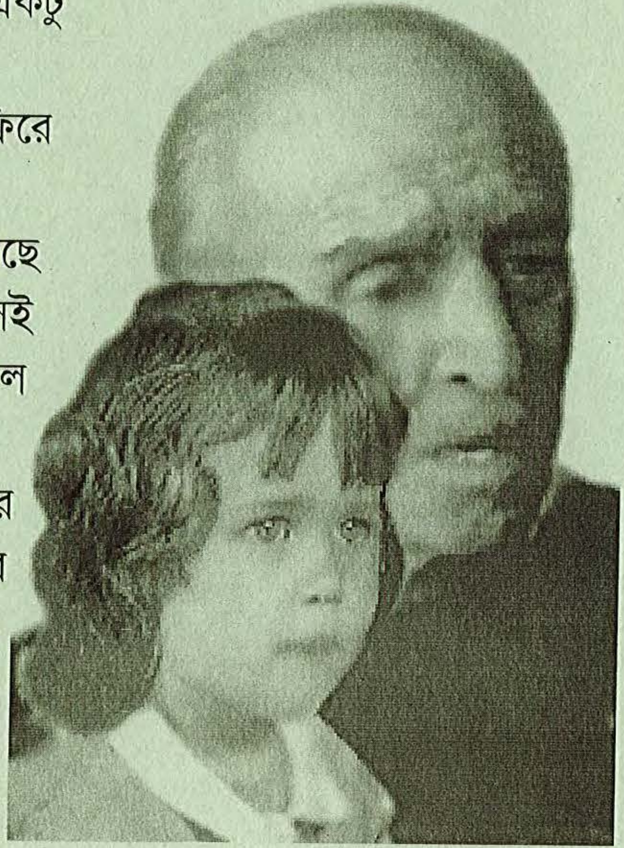

• ঐ দুটো সিকি সে ইচ্ছা করে রেখে গেছে খোকন। দেখছ না, আলাদা করে রেখেছে ?
• মানে........রেখেছে কেন ?
• এখনও বুঝতে পারছ না? তোমার জন্য রেখে গেছে, কষ্ট করে তোমাকেই দান করেছে, কারণ আজ হল ঈদের দিন। এই দুটো সিকির দাম আছে খোকন, সিন্দুকে রেখে দাও, খরচ করো না...... আর না হয় আমার কাছে বিক্রি কর, আমি দশ টাকায় কিনে নিচ্ছি।
• না চাচা। আমি....... এই দুটো সিকি....... বেচব না।

৪৪৩। বখ্‌শিস

আজ ঈদের দিন। আবুলের বয়স পাঁচ বছর। বাবা কিন্তু যখন তাকে তিরস্কার করে তখন বলে, আবুল তুই ছ'বছরে পা দিয়েছিস, আর ফাজলামি করা তোর সাজে না। তাই আজ আবুল এক সমস্যায় পড়ে গেছে। মামার কাছে ঈদের বখশিস নিতে যাবে কি না ? মা তো বলেছিল ছ'বছর না হওয়া পর্যন্ত ঈদের দিন মামার কাছে গেলে দু'টাকা বখশিস পাবে।
আবুল মাকে জিজ্ঞাসা করল,
• আম্মা, আমার বয়স কত ?
• কেন, জান না ? গত পৌষ মাসে তোমার পাঁচ বছর হল।
• তা হলে আমার বয়স পাঁচ বছর, তাই না ?
• তা তো বটে, কেন ?
• আমি মামার কাছ থেকে আসি।
মামা দু' টাকা দিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। আবুল রাজপুত্রের মত গর্ব করতে করতে ও তার সম্পদ সবাইকে দেখাতে দেখাতে বাজারে চলে গেল। আজ কিন্তু কৃষ্ণ বাবুর দোকানে যা ভীড়, তাতে একটা রসগোল্লার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। আবুল খুঁজে খুঁজে একটা টেবিল পেল যেখানে কেবল তিনজন বসে আছে, তিনজন দাড়িওয়ালা, টুপি পরা, খয়েরী রঙের পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়া অচেনা লোক। আবুলের রাজকীয় ভাব দেখে সবাই মুচকি হাসল। আবুল কিন্তু তাদের দিকে চেয়েও দেখল না। জামার পকেট থেকে তার দু'টাকা বের করে গুণে গুণে দেখতে লাগল। মামা আবার তার অভ্যাসমত আবুলকে আটটা সিকি দিয়েছে। তার মতে ভাংতি টাকা দিলে ছেলেমেয়েরা টাকার মূল্য বোঝে, আর আস্তে আস্তে খরচ করে।

আজ হোটেলের দু'জন বেয়ারা ছোকড়া খদ্দেরদের ভীড় সামলাতে পারছে না।

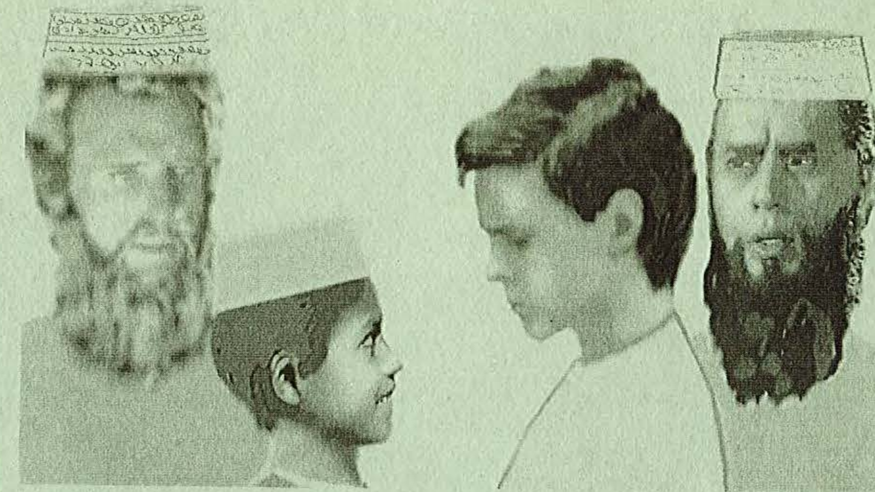

সবাই চারদিক থেকে চিৎকার করে ডাকছে। না আসলে আরও জোরে চিৎকার করে, গালাগালিও দেয়। যে ছেলেটা আবুলের টেবিল পরিস্কার করতে এল, তাকে সে চেনে, তার নাম মনা। সে গরীবের ছেলে, তার বয়স দশ বছর হয়নি, পেটে-ভাতে কাজ করে। আজ একটা চরকার মত ঘুরেও সে কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তার দু চোখ রাগে, দুঃখে ছলছল করছে। আবুল তার মুখের ভাব দেখে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। শেষে মনা নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা করল,

• তোমার জন্য কী আনব ?

• একটা রসগোল্লার দাম কত ?

• দু' টাকা।

• দু' টাকা!...আচ্ছা, দু'টাকার কমে কিছু আছে ?

• দু টাকার কমে ....হ্যাঁ, আর এক রকম গোল্লা আছে দেড় টাকা দাম, তাতে কিন্তু রস নেই।

• লোকদের চেচামেচি থেমে গিয়েছিল, সবাই ওই ছোট খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ হাসে, কেউ কেউ রাগ করে।

• কী খাবে, তাড়াতাড়ি বল, সবাই আমার উপর খেপে যাচ্ছে।

• আবুল কিন্তু মন ঠিক করতে পারছে না। আবার টাকা গুনে, আবার চিন্তা করে.......শেষে বলে,

• আচ্ছা... যেটায় রস নেই সেটা নিয়ে এস।

• মনা দ্রুত বেগে দুটো পিরিচ নিয়ে আসল, একটায় আছে সেই শুকনো গোল্লা, আর একটায় ছোট একটা কাগজ, তাতে নিপুণ ভাবে লেখাঃ- এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আবুলের সামনে পিরিচ দুটো রেখে মনা অন্যান্য খদ্দের সামলাতে গেল।

আবুল চোখের পলকে গোল্লাটা খেয়ে চলে গেল।

মনা ফিরে এসে দেখল, পিরিচের মধ্যে সাজানো আটটা সিকি, ছ'টা এক পাশে, দুটো আর এক পাশে। টুপিওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করল,

• ছেলেটা কোথায় গেল ?

• চলে গেছে, খোকন।

• এই দেখুন, দুটো সিকি বেশী দিয়েছে, আপনারা তাকে বলেননি কেন ?

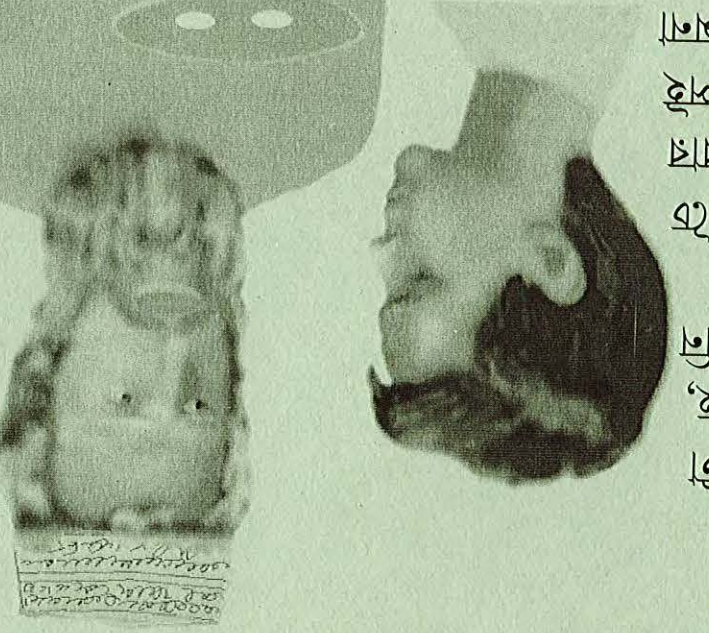

• আবার হোটেলের হৈ চৈ থেমে গিয়েছিল। সবার চোখ মনার হাতের সেই পিরিচের দিকে। মনা আবার জিজ্ঞাসা করল,

• আপনারা কিছু বলেননি কেন ?

তখন টুপিওয়ালা লোকটি বলল,

শামীম নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ভাল হল না। শহীদ তার বুকে, পেটে, চারটে ঘুষি মেরে তাকে পথে শুইয়ে দিল।

যখন উঠে বসার শক্তি পেল, তার আগেই ট্রেন চলে গিয়েছিল। শহীদ যেসব গালাগালি ছোটবেলায় শিখেছিল এখন সে সব বিশ্রী গালাগালি তার উপর ঝাড়তে লাগল,

• বোকা, শুকোরের বাচ্চা, কাপুরষ কোথাকার ! তোর মায়ের কথা ভেবেছিস? তোর বাপের কথা ভেবেছিস? তোকে তৈরী করতে ওদের বিশ বছর লেগেছে, জানিস...? আর আমার কথা ভেবেছিস? আমি কি তোর কিছুই না?...

শামীম কিন্তু এত গভীর নিরাশায় ডুবে গিয়েছে যে তার কাছে নিজের জীবন ও পরের জীবনের কোন দাম নেই। মুখে যা আসল তাই বলল,

• তুই আমার কে শুনি? তোর কাছে আমার কি দাম? আমাকে বাঁচাবার জন্য তোর মোটর সাইকেল দিবি, বল?

• শামীম!...এ তুই কি বললি শামীম?... আচ্ছা শামীম, এই নে চাবি, নে বলছি! মোটর সাইকেলটা তোর। তুই যখন এমন কথা বলতে পারলি, আমি আল্লার কসম কেটে বলছি, জীবনে আর কোনদিন ওটার উপর চড়ব না। একটা শর্ত তোকে মানতে হবে। যদি আবার মরতে যাস তার আগে চাবিটা নিজের হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

এর পরে শহীদ বি, এ, পড়তে গিয়ে সাইকেলে চড়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল । বাবা যখন দেখল তার মোটর সাইকেল আর নেই, তখন কিছু জিজ্ঞেস করল না । যখন আসল ব্যাপারটা তার কানে এল , তখন গর্ব করে বলল, আমার ছেলে মানুষ হয়েছে।

৪৪৪। মোটর সাইকেল

শহীদের ১৫ বছর বয়স। তার স্বপ্ন একটা মোটর সাইকেল। একদিন লক্ষ্য করল বাবা কোথায় মোটর সাইকেলের চাবি রাখে। তারপর বাবা কাজে চলে গেলে শহীদ চাবিটা খুঁজে পেল। সেদিন স্কুলে গেল না। তার পরদিনও না। সারা সপ্তাই চড়ল।

একদিন হঠাৎ বাবা দু'ঘন্টা আগে কাজ থেকে ফিরে এল। শহীদ সে সময় দ্রুত বেগে ফুটবলের মাঠে মোটর সাইকেলে চড়ে নক্সা কাটছিল। এমন অভিজ্ঞতা বাবারও ছিল না। বাবা শহীদকে কোন কথা বলল না। তার মনে পড়ল কি করে সে নিজে মোটর সাইকেলে চড়তে শিখেছিল। শহীদ বাড়ী ফিরে আসলে বলল, লাইসেন্স ছাড়া আর মোটর সাইকেল চালাবে না।

তার মানে... তিন বছর পরে, কারণ আঠারো বছর বয়স না হলে লাইসেন্স দেয় না।

দু' বছর পরে শহীদ নিজে টিউশনি করে চারশ টাকা যোগাড় করে লাইসেন্স করল। কিন্তু বাবা কোন জরুরী দরকার না হলে তাকে মোটর সাইকেল দিত না। বলত, শহীদ, মোটর সাইকেল আমার দরকার, নষ্ট হয়ে গেলে আর একটা কেনার টাকা আমার নেই। এত দামী খেলনা তোমাকে দেওয়ার সামর্থ আমার নেই বাবা। শহীদ মোটর সাইকেলের এক গ্যারেজে গেল। সেখানকার মালিক শহীদকে চিনত। অনেক বার সে বাবার মোটর সাইকেল সারাতে সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু

যন্ত্রপাতি ধার করে নিজেই সব কাজ করেছিল। শহীদ নিজে নিজে বই পড়ে শিখেছিল, কিন্তু শিখেছিল বিশেষভাবে কান দিয়ে মোটর সাইকেলের ভাষা শুনে। শহীদ মালিককে বলল, আমি আপনাকে প্রতিদিন তিন ঘন্টা সময় দিতে পারি। বাকি সময় আমার পড়াশোনা করতে হবে। আপনি এক মাস আমার কাজ দেখুন, তারপর আমার মাইনা ঠিক করবেন। যদি আমার পোষায়, আমি থাকব। মালিক রাজি হল। গ্যারেজে আরও তিনজন যুবক কাজ করত। মালিক শহীদের মত অবাধ্য কর্মচারী কোন দিন পায়নি। তার হাতে একটা মোটর সাইকেল দিয়ে মালিক বলত, কারবুরেটার পরিষ্কার করে দাও। শহীদ মোটর সাইকেল চালিয়ে তার শব্দ শুনত। তারপর প্লাগ পাল্টিয়ে দিত। মালিক আপত্তি করলে বলত, কারবুরেটারে কোন দোষ নেই, আপনি খুলে দেখতে পারেন, আমি খুলব না। যদি মোটরসাইকেল রীতিমত না চলে, আমি এমনি মেরামত করে দেব। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে, শহীদ অন্যদের কাজে সাহায্য করত। কোন উৎপাত করত না, শুধু বলত, ঐসব খুলে লাভ নেই, দোষ হল এখানে। তাতে যে কাজ করতে আগে তিন ঘন্টা লাগত, এখন সেই কাজ আধা ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। মালিক আশ্চর্য হয়ে দেখল, যত বাকি কাজ অনেকদিন ধরে পড়ে ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল । মাসের শেষে শহীদকে ডাকল।

• শহীদ মাসে এক হাজার টাকা দিলে খুশী হবে ?

• আরও পাঁচশো টাকা ধরে দেন। এক হাজার টাকা আমার হাতে রাখতে হবে আর বাড়ীতে আরও পাঁচশো টাকা না দিয়ে পারি না।

• আচ্ছা দেব, কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া চলে যেতে পারবে না।

• না, আমি দু'বছর থাকব। একটা পুরানো মটরসাইকেল কেনার টাকা আমার যোগাড় করতে হবে। আর আমি কথা দিচ্ছি, চলে যাবার আগে, দু'একজনকে আমার মত তৈরী করে দেব।

শহীদ তার কথা রক্ষা করল। দু'বছর পরে,যখন পচিঁশ হাজার টাকা হাতে পেয়ে কাজ ছেড়ে দিল, তার দুজন সাথী শিখে নিয়েছিল তার যাদু। মালিক সন্তুষ্ট হয়ে বলল, শহীদ, দেখ,এই মোটর সাইকেলটা নতুন অবস্থায় একসিডেন্ট করেছে। মেরামত করতে অনেক দিন লাগবে। এই পচিঁশ হাজার টাকায় নিতে পার। তোমার হাতে পনের দিনের মধ্যে নতুন হয়ে যাবে। তবে আরও তিন মাস আমার গ্যারেজে কাজ করতে হবে। শহীদ রাজি হল। মোটর সাইকেল মেরামত করতে তার আনেক দিন ও অনেক রাত লাগল। বাবা যখন বুঝল মোটর সাইকেলটা কার, তখন মনে মনে গর্ব করল। আরও গর্ব করল যখন জানল যে, শহীদ তার আই,এ,পরীক্ষায় পাশ করেছে।

শহীদ তার পরীক্ষার ফল দেখতে গিয়েছিল মোটর সাইকেলে চড়ে। ফলটা দেখে ভাবল, এবার কিন্তু বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে সারা বাংলাদেশ ঘুরে আসব। দুঃখের বিষয়,তার বন্ধু শামীম এই দ্বিতীয়বার ফেল করেছে... শহীদ একা কি করে যাবে...?

বাড়ীতে ফিরে আসার পথে একটা রেল ক্রসিং পার হতে হয়। রেলগেট বন্ধ ছিল। শহীদ মোটর সাইকেল থামিয়ে চাবিটা বের করে নিল। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। হঠাৎ দেখল দুশো তিনশো মিটার দূরে রেল লাইনের পাশে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। শামীম যে! ওর বাড়ী তো এখানে নয়। শামীম রেল লাইনের পাশে করছে কি!... হঠাৎ চমকে উঠল! তার মনে পড়ল, পরীক্ষার প্রথম দিন, ক্লাসে ঢুকবার সময় শামীম কী বলেছিলঃ- এবার যদি পাশ করতে না করি , রেল লাইন ছাড়া আর গতি নেই । সেদিন শহীদ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল । এবার হাসল না। ট্রেন আর বেশী দূর নয়। শহীদ দৌড়ে গেল। জীবনে এত দ্রুত কোন দিন দৌড়ায়নি । যখন শামীমকে ধরে ফেলল তখন ট্রেন কাছাকাছি এসে গেছে।

৪৪৬। চুরির সাক্ষী

আলী তার পাঁচ বছরের ছেলের বায়না সামলাতে না পেরে তাকে সঙ্গে করে পেয়ারার বাগান দেখতে নিয়ে গেল। দুঃখের বিষয়, খাওয়ার মত কোন গাছে পেয়ারা দেখল না। সবগুলো এখনও এত কাঁচা যে দাঁত বসান যায় না। মন মরা হয়ে বাপ বেটা দুজনে ফিরে আসছিল, এমন সময় ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আর একটা বাগান দেখাল,

- দেখ দেখ আব্বা কি সুন্দর পেয়ারা!
- তাই তো! এই বাগানের পেয়ারা যে ভিন্ন! আগেই পেকে যায়!

অসুবিধা এই যে, বাগানটা আমাদের নয়, এটা হোসেন সাহেবের। এই গাছগুলো সে খুব কষ্টে লাগিয়েছে, তার দুইটি ছেলে আছে, তারাও পেয়ারা খেতে ভালবাসে... আচ্ছা, তুমি এখানে দাড়াও, আমি দেখে আসি পেয়ারা পেকেছে কি না। তুমি লক্ষ্য রেখ, কেউ যেন আমাকে না দেখে ফেলে। এই বলে বাবা ভিতরে গেল। ভিতরে কেউ নেই। থামল একটা সুন্দর গাছের তলে। পেয়ারা খুব নিচু, এক লাফ দিলে ধরা যায়। ছেলেটার জন্য একটা নিলে কি আর হবে...

কিন্তু যেই লাফ দিতে যায় তার কানে এল ছেলেটার চিকন সুর,

- না আব্বু, না! তিনি দেখতেছেন!

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকে ফিরে এল। এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখল... কেউ নেই। জিজ্ঞাসা করল, কই আব্বু...? কে দেখতেছে ?

- কেন আব্বু...? কালকে তুমি বললে, আল্লাহ সব কিছু দেখেন আমি ভাবলাম, আল্লাহ তোমাকেও দেখতেছেন। তাই আমি ডাকলাম।

৪৪৫। আলোর চুল

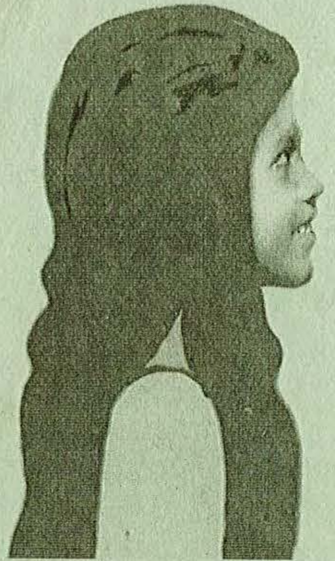

আলোর বয়স সাত বছর। এই বছরে ক্লাস টু'তে উঠেছে। আলোর আছে কালো ঘন চুল, রেশমের মত মোলায়েম। মাজা পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। যখন পথে বের হয় তখন সবাই বলে, কি সুন্দর চুল! তবে অন্যান্য মেয়েরা কেউ তাকে হিংসা করে না, কারণ আলো এমন মেয়ে যে, হাতে যা আছে তা সবাইকে বিলি করে দেয়, তার হাসিও সারাদিন বিলি করে দেয়, সে এমন হাসি যে, দেখলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। নিজের জন্য রাখে শুধু চুল। প্রতিদিন চুল বাঁধার একটি নতুন কায়দা আবিষ্কার করে, বেণী বাঁধে, বেণী খোলে, খোঁপা বাঁধে, খোঁপা খোলে, নেচে নেচে মাথা ঝাঁকিয়ে চুল আকাশে উড়ায়, চুল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে, চুল নাচিয়ে আরও কত কি করে তা বলে শেষ করা যায় না।

কিন্তু এক দিন তার রক্তে ক্যান্সার হল। রোগের আসল নাম লিউকিমিয়া। তখন আলো আর স্কুলে আসতে পারল না। ডাক্তাররা ছয় মাস ধরে ওষুধ দিতে লাগল। ওষুধ এত কড়া যে, আলো মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় তার মাথার চুল সব পড়ে গেল। মাথাটা দেখাচ্ছিল মরা মানুষের

খুলির মত। কিন্তু অবশেষে ডাক্তার বলল, তুমি ভাগ্যবান, এ রোগ হলে অধিকাংশ শিশু মরে যায়, তুমি সুস্থ হয়ে গেলে। শুধু তোমার চুল পড়ে গেছে। আবার বেড়ে উঠতে এক বছর লেগে যাবে।

আলো ছয় মাস হাসপাতালে ছিল, এবার বাড়ী ফিরে এল। তবে যখন মা-বাবা স্কুলের কথা বলে, সে উত্তর দেয়, আমি এ অবস্থায় স্কুলে যেতে পারব না। কিন্তু তার ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা যখন শুনল আলো সুস্থ হয়ে গেছে, তখন একদিন সবাই মিলে তাকে একটা চিঠি দিল। "প্রিয় আলো, তুমি স্কুলে না আসলে আমরা খুব দুঃখ পাব। তুমি খুব ভাল মেয়ে তাই আমরা তোমাকে দেখতে চাই, তোমার চুল থাক আর নাইবা থাক। ইতি, ক্লাস টু-র ছেলেমেয়েরা।" নীচে সকলে নাম সই করেছিল।

আলো চিঠিটা পেয়ে খুব খুশী হল। খুব চিন্তা করল। শেষে কিন্তু উত্তর দিল, "প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে আমার দুঃখ হয়। কিন্তু এই অবস্থায় স্কুলে যেতে আমার লজ্জা করে, তাই আমার চুল না ওঠা পর্যন্ত আমি রাস্তায় বের হতে পারব না। ইতি, আলো।"

দুদিন পরে ক্লাস টু-র আপা আলোদের বাড়ী এল। ক্লাস টু-র ছাত্রেরা চাঁদা তুলে একটা সুন্দর ওড়না কিনেছিল। আপা ওড়নাটা আলোর মাথায় জড়িয়ে একটা পাগড়ী তৈরি করে দিল, তারপর ওকে আয়নার সামনে এনে বলল, এই দেখ, তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

পরের দিন আলো স্কুলে ফিরে এলো। সবাই হাততালি দিল। তারপর এক একজন এসে তাকে এক একটা ছোট উপহার দিল। কেউ দিল মাটির পুতুল, কেউ বাদাম ভাজা, কেউ মার্বেল, কেউ আংটি, কেউ চুড়ি। সকলের শেষে এল শেলী। শেলীর চুল কিন্তু আলোর চুলের মত সুন্দর ও মোলায়েম। সেও আলোর মত আজ একটা পাগড়ী পরেছিল।

আপা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি দেবে শেলী ? তখন শেলী তার ব্যাগ খুলে বের করল একটা লম্বা কালো চুলের বেণী। এই নাও আলো। সবাই চোখ বড় বড় করে তাকাল, ওটা আবার কি ?...

তখন হঠাৎ শেলী, মাথায় হাত দিয়ে পাগড়ীটা খুলে ফেলল। সব ছাত্ররা হাঁ করে রইল। তারপর সবাই হাসল। শেলীর মাথা একটা ডিমের মত সাদা, পরিষ্কার। সকালে সে কাউকে কিছু না বলে তার বেণী কেটে ফেলেছে। তারপর নাপিতের কাছে গিয়ে বলেছে, এই নাও পাঁচ টাকা, আমার মাথায় উঁকুন আছে, চুল কেটে ফেল, মাথা যেন একটা ডিমের মত পরিষ্কার দেখায়।

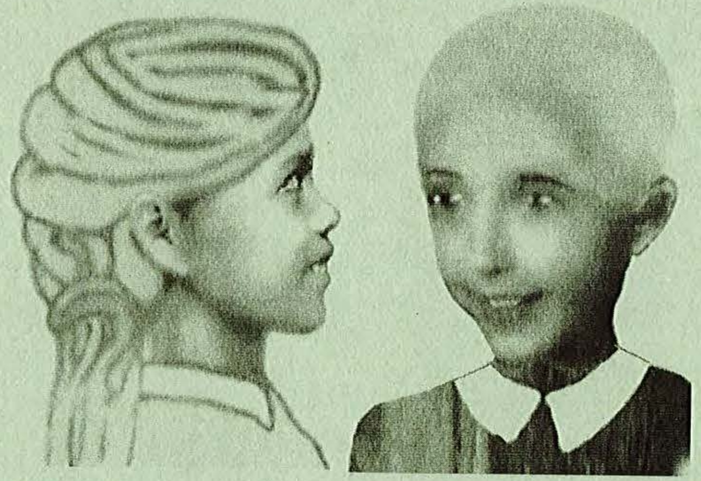

সবাই যখন হেসে ফেলল, তখন শেলী হঠাৎ বুঝল, সে কত বেখাপ্পা কাজ করে ফেলেছে। তার চোখে হঠাৎ পানি আসল। কিন্তু পাগড়ী দিয়ে চোখ মুছে ফেল। বলল, আমাদের দু'জনের চুল একসঙ্গে বেড়ে উঠবে। তোমার মাথাও সাদা,আমার মাথাও সাদা, এবার তোমার আর লজ্জা করতে হবে না। এই হল আমার উপহার।

ছেলেমেয়েদের হাসি হঠাৎ থেমে গেল। সবাই চুপ করে রইল। তখন আলো হঠাৎ তার পাগড়ীটা খুলে ফেলল,আর শেলীকে আলিঙ্গন করতে গেল। সবাই হাততালি দিয়ে ঘর কাঁপিয়ে দিল।

৪৪৭। বাদাম ভাজা

আলমের বয়স সাত বছর। সে প্রতিদিন বুড়ো দোকানদারের কাছে একটা পুরাতন খবরের কাগজ বেচতে আসে। দোকানদার তার খাতা খুলে আলমের নামে পাওনাটা লিখে রাখে। পাওনাটা এক টাকা হলে আলমকে বাদাম ভাজা দিয়ে ঋণ শোধ করে। এক কুড়ি বাদাম ভাজা। প্রতিদিন আলম চলে যাবার আগে গম্ভীরভাবে বলে, দাদু, হ্যাণ্ডশেক। তখন দোকানদার তার হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ রাখে, তারপর ছেড়ে দেয়। তখন আলম দৌড়ে চলে যায়। আজ আলমের হাতে খবরের কাগজ নেই।

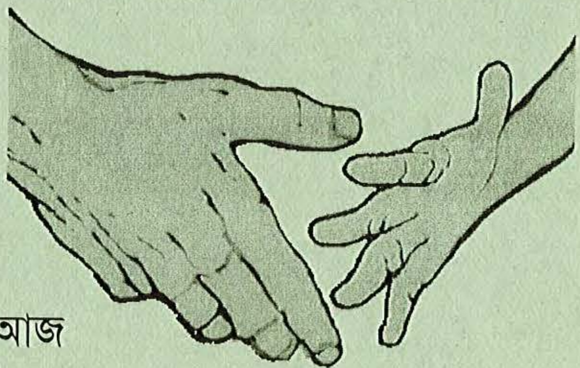

- কাগজ কই?
- নেই। মা বলেছে, মালিকের ছেলে নাকি নৌকা তৈরী করার জন্য খবরের কাগজ নিয়েছে।
- অসুবিধা নেই, তোমার এমনি তো এক টাকা পাওনা হয়ে গেছে, আমি আগে লক্ষ্য করিনি। এই নাও তোমার বাদাম ভাজা। এখন খাবে না কাগজে মুড়ে দেব?
- না দাদু, পাঁচটা বাদাম পকেটে নেব মায়ের জন্য। বাকীগুলো আমরা দু'জনে একসঙ্গে খাব। আমি তো জানি আমার পাওনা এক টাকা হয়নি, তুমি আমাকে ঠকাচ্ছে।

আলম দোকানদারের কোলে উঠে গুটি সুটি মেরে বসল। এইভাবে বাদাম ভাজা খেতে লাগল বুড়ো আর শিশু, একজন তার যাত্রার শেষে , আর একজন তার যাত্রার শুরুতে। দাদুর কানে বেজে ওঠে রবি

ঠাকুরের গান, যে গান তিনি লিখেছিলেন তার জীবনের শেষে যখন নাতনি তার মুখ থেকে একটা নতুন গান শোনার বায়না ধরেছিলঃ-

... তোমার হল শুরু -
আমার হল সারা।
তোমায় আমায় মিলে -
এমনি বহে ধারা,
তোমার হল শুরু -
আমার হল সারা...

বাদাম শেষ হলে আলম উঠে দাড়াঁয়। দেখে, দাদুর চোখে পানি।

- তোমার চোখ ভেজা কেন ?
- ও, কিছু না। মশা লেগেছে আর কি...
- দাদু... হ্যান্ডশেক।

আলম তার হাত বাড়াল। দোকানদার ছেলেটার হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ রেখে ছেড়ে দিল। তখন আলম দৌড়ে চলে গেল।

রইল। তার মন কাঁদছিল। মনে মনে ভাবছিল, বাংলাদেশে আমরা বিহারী চিরকাল বিদেশী হয়ে থাকব। দুনিয়াতে আমাদের কোন দেশ নেই। আমাদের জাতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অনেকে মরে গেছে, অনেকে পালিয়ে কোথায় গেছে কি জানি। দুনিয়াতে আমরা একা।

ছেলেটা হঠাৎ বলে উঠল, আম্মা বাড়ী যাব কখন? জাকির ভাবল, বাড়ী কি আর তোমার আছে বাবা ? ভিটা পেলেই ভাগ্য। প্রাণ রক্ষা করতে পারলেই ভাগ্য! অধিক আমার ! একটা ছেলের জন্ম দিয়ে তাকে একটা দেশ দিতে পারলাম না, একটা জাতিও দিতে পারলাম না! আমার বেঁচে থেকে কী লাভ ?

নজরুল জাকিরের দিকে তাকাচ্ছিল । তার চোখের জল দেখে বুঝতে পারছিল তার মনের কথা। সান্ত্বনা দেওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে যশোর এসে গেছে। হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। থেমে গেল তার বাড়ীর সামনে। নজরুল বলল, জাকির, এসে গেছি। এই নাও তোমার চাবী। গত সপ্তা ঘরের বাইরে ও ভিতরে নূতন রং দিয়েছি। কারখানায়ও নূতন রং দিয়েছি। যন্ত্রপাতি যা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে তা নূতন কিনেছি। দু'বছর আগে যা ছিল তাই আছে। ঘরেও যা ছিল তাই আছে, কিছু নষ্ট হয়নি। আর হ্যাঁ, এটা হল তোমার ব্যাংকের হিসাব। প্রতি মাসে ঘর ও কারখানার ভাড়া দিয়েছি। ভাল কথা,আমার বউকে বলেছি, তোমাদের রান্নাঘরে ভাত রান্না করে রাখতে...... কি হচ্ছে তোমার ? কি হচ্ছে তোমাদের? কাঁদছ কেন? এই নাও চাবি! আমার কাজ আছে কিন্তু ! আমি আসি তাহলে...

৪৪৮। সততা

নজরুল ও জাকির শিশুকাল থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছিল। একসঙ্গে খেলা করেছিল, একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছিল, একই বই পড়েছিল, একই গান গেয়েছিল, আবার একই দিনেই বিয়ে করেছিল, আর দুজনেরই একটা করে বাচ্চা হয়েছিল প্রায় একই দিনে। এখন তাদের বয়স ত্রিশ বছরের বেশী, তবুও তারা পরস্পরের মুখ না দেখে এক দিনও থাকতে পারে না। কিন্তু একাত্তর সালের মার্চ মাসে একদিন শেখ মুজিবর

রহমান ঘোষণা করলেন, আজ থেকে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা দেশ। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল। এক পক্ষে যারা পাকিস্তানের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চায়, তারা, আর এক পক্ষে যারা আলাদা হতে চায়, তারা। জাকির ছিল বিহারী। তার বাবা ও আত্মীয়-স্বজন উর্দু ভাষায় কথা বলত। পাকিস্তানীরাও উর্দু ভাষায় কথা বলে, তাই বিহারীদের সঙ্গে ওদের গভীর সম্পর্ক। তারা বাঙ্গালীদের চেয়ে বিহারীদের বেশী পছন্দ করত ও বিশ্বাস করত। এদিকে বাঙ্গালীরা তাদের হিংসা করত। সুতরাং বিহারীরা পাকিস্তানের পক্ষে, একতার পক্ষে দাড়াঁল। তারা ভাবল, বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

সেদিন জাকির ঘর থেকে বের হল না। তার ছোট কারখানা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। ভিতরে তার দুটো ইলেকট্রিক ড্রিল ও নূতন লেদ মেশিন। এগুলো কেনার জন্য সে টাকা জমিয়েছিল দশ বছর ধরে। এখন সারা যশোরে জাকিরের মত নিপুন কাজ কেউ করতে পারে

না। সেজন্য তার উপরে অনেকে হিংসা করে। তাকে ক্ষতি করতে পারলেও ছাড়বে না।

কিছুদিন আগে থেকে জাকির এক মাসের খোরাকী কিনে রেখেছিল। এবার তার ছোট মেশিন গান ও বুলেটের বাক্স আলমারীর ভিতর থেকে বের করে অয়লিং করে নিল । ভাবল, যদি মরতে হয়, লড়াই করে মরব। সন্ধার পর কিন্তু নজরুল তার দরজায় ধাক্কা দিল। বলল, জাকির, দু'বছরের জন্য তোমার ঘর ও তোমার কারখানা লীজ নিতে এসেছি। যদি বাঁচতে চাও, আজ রাতে তোমার চলে যেতে হবে। তোমাকে অগ্রিম দেওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে আমার সব টাকা তুলে নিয়েছি, এই নাও। যাবার জন্য যা একান্তই প্রয়োজন তা সঙ্গে করে নাও, আর কিছু নিও না। তোমাদের অনেক পথ হেঁটে যেতে হবে। তবে তোমাদের কোন বিপদ হবে না, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। এই কাগজে সই দাও যেন কেউ তোমার ঘরের উপর দাবী করতে না পারে।

এই ভাবে জাকির, তার বাবা-মা ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, দেশ ছেড়ে চলে গেল। ইন্ডিয়ায় গিয়ে তিন মাস একটা রিফুজী ক্যাম্পে আশ্রয় নিল, তারপর বাইরে একটা কাজ পেয়ে ক্যাম্প ছেড়ে দিল।

নয় মাস পর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তখন বাংলাদেশ ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেল। তখন স্বাধীন বাংলাদেশে বিহারীদের উপর অত্যাচার শুরু হল। যুদ্ধের সময় তারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেছে, এবার মাসুল দিতে হল।

তখন নজরুল জাকিরের ঠিকানায় একটা চিঠি দিল। 'প্রিয় জাকির, তোমরা যদি এখন বাংলাদেশে ফিরে আস, আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। কষ্ট করে আরও কিছুদিন ওখানে থাক।'

নজরুল কিন্তু জানত না জাকির কত কষ্টে আছে। বাংলাদেশে যেমন, ভারতেও তেমনি কেউ বিহারীদের আশ্রয় দিতে চাচ্ছিল না। জাকির চিঠি দিল, 'প্রিয় নজরুল, মরতে যখন হয় তখন তোমাদের কাছে ফিরে এসে মরি। আমরা ফিরে আসতে চাই।'

নজরুল আবার চিঠি দিল। 'প্রিয় জাকির, কষ্ট করেও যদি ওখানে বেঁচে থাকতে পার, তা হলে ওখানে থাক, এই আমার অনুরোধ। এখানে আজকাল যদি কেউ তোমাদের একজনকে মেরে ফেলে সবাই তাকে ভাল ছাড়া মন্দ বলবে না। যুদ্ধের সময় তোমরা ও আমরা সবাই পশু হয়ে গেছি। যুদ্ধের পরে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে সময় লাগে। সে সময়টুকু দেরী করে এসো। বাহকের হাতে আমি টাকা পাঠাচ্ছি, বেশী না, কারণ পথে বিপদ হতে পারে। ইতি, নজরুল ।

আরও নয় মাস কেটে গেল । তখন নজরুল আর একটা চিঠি দিল, 'প্রিয় জাকির, এবার যদি ওখানে আর বাঁচতে না পার তবে সব কিছু বিক্রি করে ফিরে এসো। বাহকের কাছে জানাও কোন দিন বর্ডার পার হবে। আমি বর্ডারে থাকব। ইতি, নজরুল।'

জাকির তারিখ ও সময় জানিয়ে দিল, আর অবশ্যই ঠিক সময় ফিরে এলো। নজরুল বর্ডারে ছিল, এমন কি একটা জীপ ভাড়া করেছিল। সেখান থেকে যশোর এক ঘন্টার পথ। কেউ কথা বলতে পারছে না। নজরুল যুদ্ধের সময় যা দেখেছে তাই নিয়ে আলাপ করতে চায় না। জাকির কত কষ্টে জীবন কাটিয়েছে, যেখানে তার আপন কেউ ছিল না, সে কথা বলল। তারপর চুপ করে

৪৪৯। বারোটা নাড়ু

বাবলু মামার বাড়ী এসে চুরি করে নাড়ু খাচ্ছে। ঠিক সে সময় মামা ডাক দেয়। বাবলুর মুখে নাড়ু ভর্তি। উত্তর দিতে পারছে না।

• আগে এলে না কেন, বদমায়েশ?

• মামা, আমি... একটু পানি খাচ্ছিলাম।

• পানি না ছাই! দাড়াও, মজা দেখাচ্ছি।

নানা ঘরে বসে ছিল। সে এক নজরে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। বলল,

• সেকি ! আমার বাবুকে ছেড়ে দাও তো! আমার একটা কাজ আছে, সে আমাকে সাহায্য করবে।

বাবলু বেঁচে গেল। জিজ্ঞেস করল,

• কি কাজ?

• ইঁদুর আমাদের ধান খেয়ে ফেলছে। আমি ইঁদুর মারবার জন্য নাড়ু তৈরি করতে বলেছি, চল, ইঁদুরের গর্ত খুঁজি। তার পাশে একটা করে নাড়ু রেখে আসি।

• নাড়ুতে কি আছে?

• কেন, ইঁদুর মারার বিষ আছে।

বাবলুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল...

• আচ্ছা নানা, মানুষ যদি একটা খায়, তাহলে কি হয়?

• তার ভীষণ পেটে ব্যথা হয়, তিনদিন ডায়রিয়া হয়।

• আর যদি কেউ বারোটা খায়, তা হলে কি হয়?

• তুই বোকা! বারোটা নাড়ু কেউ খায়?...

• কিন্ত যদি খায়, তাহলে কি হয়?

• যদি খায় তো ... রক্ষা নেই, তিন ঘন্টার বেশী বাঁচবে না।

• নানা, আমি তাহলে মরে যাব! আমি বারোটা নাড়ু খেয়েছি।

মামা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরালো। হাসি ঠেকাতে পারছিল না।

• সত্যি নানা, আমি বারোটা নাড়ু খেয়েছি, আমি মরে যাব তাহলে।

• সর্বনাশ! কি বলল? বারোটা !... বারোটা নাড়ু খেয়েছ তুমি! সত্যিই? আরে কে আছিস, আমার বাবুকে বাঁচাতে হবে। শিগ্‌গির বিষ নামানোর ওষুধ নিয়ে এস। চোখের ইশারা দিয়ে সে মামাকে কি যেন বুঝাল। পনের মিনিট পর বাবলু তার ওষুধ খেল। নিম পাতা আর চিরতার রস। জীবনে সে এত তিতা ওষুধ খায়নি। তার খুব বমি হল। যত নাড়ু খেয়েছিল সব বেরিয়ে আসল। রাত্রে কিছু খেল না, ওষুধ খাওয়ার পরে নাকি চব্বিশ ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হয়, শুধু পানি ছাড়া আর কিছু খাওয়া যায় না। বাবলুর না খেয়ে মরে যাওয়ার উপক্রম, কিন্তু বীরের মত সব সহ্য করল। শেষে মামীর মায়া হল।

• চল বাবলু, এবার সুস্থ হয়েছ। আমি তোমার জন্য নাড়ু তৈরী করেছি। এবার নাড়ুতে বিষ নেই। যত ইচ্ছা খেতে পার।

• না মামী জীবনে আমি আর কোনদিন নাড়ু খাব না। মরে গেলেও না। সেদিন থেকে বাবলু যা খায়, তা সবার সামনে খায়, সবার সঙ্গে খায়। খাবারে যদি ইঁদুর মারার বিষ থাকে?...

পারে। রাত্রে কোন সময় বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে মাদুরের উপর পড়ে শুয়ে পড়ল তা বুঝতে পারল না। সকালে যখন জেগে উঠল, তার আগে নার্স বাবার মুখের ব্যান্ডেজ পাল্টে দিয়েছিল। ডাক্তার এসে তাকে এক নজর দেখে নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, এখনও বেঁচে আছে ?
মানিক আবার কেঁদে ফেলল। তখন ডাক্তার তাকে দেখতে পেল।

- এই ছেলেটি কে ?
- তার ছেলে, গ্রাম থেকে এসেছে।
- ডাক্তার সাহেব,আব্বাকে সুস্থ করে দিন।
- আমরা যা করতে পারি, তাই করব খোকন। বাকী সব আল্লার হাতে।

এভাবে এক সপ্তা কেটে গেল। মানিক বাবার পাশে বসে শুধু তার হাত ধরতে লাগল, সময় সময় কথা বলত, মায়ের কথা, ভাইবোনদের কথা, স্কুলের কথা, গ্রামবাসীদের কথা। সময় সময় বাবা মানিকের হাত চেপে ধরত, এ ছাড়া সে বেঁচে আছে না মরে গেছে এবং কথা বুঝতে পারছে কি না তা জানবার উপায় নেই। একদিন ডাক্তার রোগীকে দেখার পর মানিককে জিজ্ঞাস করল, তোমার নাম কি খোকন ?

- মানিক, ডাক্তার সাহেব।
- তোমার মা কোথায়?
- দেশে আছে। ভাইবোনকে দেখবার মত বাড়ীতে কেউ নেই... ডাক্তার সাহেব, বাবা সেরে উঠবে তো ?
- জানি না, খোকন... তবে তোমার গুণেই সে এখনও বেচেঁ আছে। তুমি যদি কাছে না থাকতে সে অনেক আগে মারা যেত... । তোমার দাম আছে মানিক। তোমার মত ছেলে আমার থাকলে, সুখী হতাম।

এই বলে ডাক্তার চলে গেল। তার দু' চোখ ছলছল করছিল।

এমন সময় হলের বাইরে থেকে একটা কন্ঠ ভেসে এল। গভীর, পরিচিত কন্ঠঃ- মানিক!...

৪৫০। ছোট ডাক্তার ১

লালু কর্মকার যখন রাস্তায় বের হয়, তখন সবাই তার দিকে তাকায়। ছয় ফুট লম্বা মানুষ, যেমন লম্বা তেমন মজবুত। তাকে দেখলে সবাই ভাবে এমন লোকের শত্রু হওয়ার চেয়ে বন্ধু হওয়া ভাল। তার মুখ কোনদিন পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। কয়লার ধূয়া এত তেলতেলে যে, গায়ে লাগলে তা তুলতে অনেক সাবান খরচ হয়। ত্বাই লালু কর্মকার পূজা-পার্বণের সময় ছাড়া পুরোপুরি গোসল করে না। এদিকে লালু কর্মকার এত নিখুঁতভাবে কাজ করে যে, গ্রামের সবাই তার কাছে আসে। তবে ছোট একটা গ্রামে সময় সময় কাজ থাকে না। লালুর জমা টাকা ফুরিয়ে যায়। তখন পরিবার ছেলেমেয়ে বাঁচাবার জন্য বাসে চড়ে ঢাকা চলে যায়। এ বছর ঠিক তাই ঘটেছে।

ঢাকায় থাকতে থাকতে একদিন লালুর অসুখ হল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে লালু বাড়ীতে চিঠি লিখলঃ- মানিককে পাঠিয়ে দাও। আমি আছি মোহম্মদপুর সদর হাসপাতালে। ইতি- লালু।

মানিকের বয়স চৌদ্দ বছর। সে কোনদিন ঢাকায় যায়নি। ঘরে যে কয়টা টাকা ছিল তার হাতে দিয়ে, মা তাকে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিল। সেখানে একজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল, ঢাকায় তার বাড়ী। তাকে অনুরোধ করল যেন মানিককে সদর হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। গাবতলী বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে মানিক রিক্সায় উঠল। মহিলাটি রিক্সাওয়ালাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলল, ছেলেটাকে সদর হাসপাতালে যেখানে রোগী ভর্তি করে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। সেজন্য দশ টাকা ভাড়া পাবে। রিক্সাওয়ালা তাকে হাসপাতালে পৌছে দিল। তারপর ভাড়া নিয়ে সে চলে গেল। মানিক হাসপাতালের ভিতরে ও বাইরে এত মানুষ দেখে ভয় পেয়ে গেল। যেখানে রোগী ভর্তি করা হয় সেখানে একটা লম্বা

টেবিল ছিল। তার পিছনে চারটি মহিলা। লোকেরা তাদের নানা প্রশ্ন করছিল, মহিলারা তাদের খাতা দেখে উত্তর দিচ্ছিল। ফাক পেয়ে মানিক তাদের একজনকে বলল,

• আমি বাবাকে দেখতে এসেছি, কোথায় আছে?

• তোমার বাবার নাম কি?

• লালচাদঁ কর্মকার। সবাই তাকে লালু বলে ডাকে।

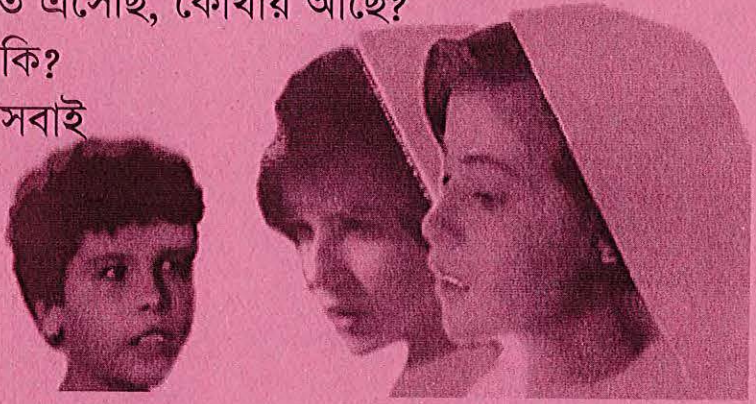

• বাড়ী কোথায় ?

• কামারখালী, মাগুরা।

• কখন ভর্তি হয়েছে ?

• জানি না, আমরা চিঠি পেলাম গতকাল।

• তার কি অসুখ ?

• চিঠিতে লেখা নেই।

• আমার খাতায় এ সপ্তায় লালচাঁদ নামে কেউ ভর্তি হয়নি, অন্যদের কাছে খোঁজ নাও।

• আপা, আমার বাবার নাম লালচাঁদ কর্মকার, বাড়ী কামারখালী, এ সপ্তার মধ্যে ভর্তি হয়েছে, কত নম্বরে আছে ?

• এই বিল্ডিঙে তিন দিন আগে লালচাদঁ বলে একজন লোক ভর্তি হল, মুখে ক্যান্সার হয়েছে।

• মুখে কি হয়েছে .... ?

• বললাম তো ক্যান্সার হয়েছে।

• সেরে উঠবে তো ?

• তা বলতে পারি না, খোকন। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কর।

• বাবা কোন তলায় আছে ?

• তিনতলায়, রুম নম্বর ৩১৪, বেড নম্বর ৪৫।

• তিনতলায় যাব কোন দিক দিয়ে ?

• ঐ দেখ, ঐ সিঁড়ি বেয়ে যাও। তারপর ঘুরে আর একটা সিঁড়ি পাবে, তারপর আর একটা, তারপর জিজ্ঞেস করবে ৩১৪ নম্বর হল কোথায় ? সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে ৪৫ নম্বর কোথায় ? নাও, এই কাগজ দেখালে লোকেরা তোমাকে পৌঁছে দেবে।

৩১৪ নম্বর হলে পৌঁছে মানিকের ভয় বাড়তে লাগল। এই হলে যত লোক আছে, তাদের চেহারা মরা মানুষের মত। তাদের বাঁচবার জন্য এখানে রাখা হয়নি.... মরার জন্য রাখা হয়েছে। সবার মুখে যেন একটা কথা লেখা আছে .... আমাকে রেহাই দাও, আমি মরতে চাই। কিন্তু মানিক ৪৫ নম্বরে এসে যা দেখতে পেল, তা আরও ভয়ানক। খাটে বাবার মত লম্বা একটা মানুষ পড়ে ছিল। তার পুরো মুখটা সাদা ব্যান্ডেজ দিয়ে পেঁচানো। দু'চোখ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। চোখ আবার বন্ধ, চোখের পাতা লাল। খাটের বাম পাশে একটা বোতল ঝুলানো, সেখান থেকে একটা নল হাতের মধ্যে ঢুকানো ছিল। তারা বাবাকে কী করেছে! মানিক আর সহ্য করতে পারল না। চোখের পানিতে বিছানাটা ভাসিয়ে দিতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বাবার হাত ধরে ডাকতে লাগল, বাবা ! .... বাবা ! .... বাবা ... ।

পর পর দু'জন নার্স এসে তাকে সান্তনা দিল। বলল, বাড়ী কোথায় ? বলল, ওঃ, বেচারা। আর একজন এসে ঝুলানো বোতলটা পাল্টিয়ে দিয়ে গেল। আর একজন কিছু খাবার নিয়ে আসল, একটা মাদুরও পেতে দিল, যেন সে খাটের পাশে ঘুমাতে

৪৫১। ছোট ডাক্তার ২

মানিক চমকে উঠল। ছয় ফুট লম্বা একটি মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছিল। মানিক চিৎকার করে উঠল, বাবা ! তারপর দৌড়ে তার গলা ধরে কাঁদতে লাগল, বাবা ! ওরা আমাকে ভুল খাট দেখিয়েছে, আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে যাবে... সারা সপ্তা কেঁদেছি।

• কই, দেখি? ওঃ, বেচারা ! সে আর বেশীদিন বাঁচবে না...

তা... আমি সুস্থ হয়ে গেছি। চল বাড়ী যাই। তোমার মা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে, চল।

• বাবা... এই লোকটি মরে যাচ্ছে। তার কাছে কেউ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, একা একা মরে যাচ্ছে। আমি তাকে ফেলে যেতে পারব না।

• কি করবে... ?

• তুমি বাড়ী যাও, আমি পরে আসব।

মানিক আরও তিন দিন সেই অচেনা মানুষের কাছে থেকে গেল। চতুর্থ দিন ভোরে উঠে যখন তার হাত ধরল তখন লোকটি অনেকক্ষণ ধরে তার হাত চেপে রইল। তারপর আস্তে আস্তে তার হাত ঢিলা হয়ে গেল..... মানিক কেঁদে ফেলল... এই লোকটি সারা রাত প্রাণ ধরে রেখেছিল। তার হাতের ছোঁয়া না পাওয়া পর্যন্ত মরতে চায়নি।

এবার নার্স এল, ডাক্তার এল। ডাক্তার মানিকের চোখ মুছে দিল। বলল, মানিক, এবার বাড়ি যাও। তুমি এই অচেনা মানুষের জন্য যা

করেছ তার চেয়ে বেশী কোন সন্তান করতে পারত না। নাও, এই কাগজে আমার ঠিকানা লেখা আছে। বাবাকে দেবে। বলবে যে, তোমার লেখাপড়ার জন্য যদি কোনদিন টাকা লাগে, আমাকে যেন চিঠি দিয়ে জানায়।

লালু কর্মকার কোনদিন ডাক্তারের কাছে টাকা চাইল না। লালু কর্মকার নিজের ছেলেকে পড়াবার জন্য পরের কাছে হাত পাতে না।

চৌদ্দ বছর পর। একদিন ডাক্তার সাহেব মোহাম্মদপুর সদর হাসপাতালের তিনতলায় রোগী দেখছিল। তিনশ চৌদ্দ নম্বর রুম পরিদর্শন করতে গিয়ে পয়তাল্লিশ নম্বর খাটে পৌছে গেল। তার পাশে এক যুবক দাড়িয়ে ছিল।

- ডাক্তার সাহেব, আমার নাম মানিক। আপনার মনে আছে ?
- তোমার বাবার নাম লালচাঁদ কর্মকার, বাড়ী কামারখালী। তুমি গত মাসে ডাক্তারী পরীক্ষা পাস করেছ। আমি এই চৌদ্দ বছর ধরে তোমার খোঁজ-খবর, রেখেছি। যদি কোন বিপদে পড়তে আমি এগিয়ে আসতাম।
- ডাক্তার সাহেব, আপনার কথার জন্যই আমি ডাক্তার হয়েছি। একদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন, মানিক, তোমার গুনেই বাবা এখনও বেঁচে আছে। তুমি যদি কাছে না থাকতে সে অনেক আগে মারা যেত। সেজন্য আমি ডাক্তার হয়েছি... কোন মানুষ যেন তার শেষ দিনের আগে না মরে।

পরের দিন স্কুলের বাকী ছাত্র সার্কাস দেখতে গেল, কিন্তু টিকিট পেল না, সব বিক্রি হয়ে গেছে। তারপরের দিন ছিল শেষ দিন। ছাত্ররা এসে সকলের সামনে বসে পড়ল। তাদের পিছনে একটা জায়গাও খালি নেই। পলাশ যখন তার জরির পোশাক পরে ঘোড়ায় উঠে দাঁড়াল, তখন হাততালি শেষ হতে চাচ্ছিল না। যখন দড়ির উপর দিয়ে হাঁটছিল তখন লোকেরা ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। শেষে পলাশ নেমে এসে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিল। তখন লোকেরা চিৎকার করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।

এক সময় ঘুরে ঘুরে সে আমার সামনে এসে দাড়াল। পকেট থেকে

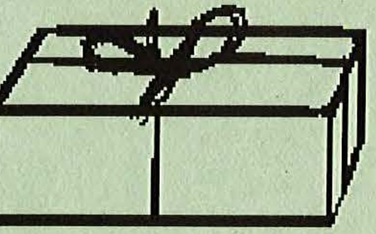

একটা ছোট প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি প্যাকেট খুলে দেখলাম... সেই খান্টা!... আমার চোখে পানি আসল। মনে করেছিলাম আমি পলাশকে কত বড় উপকার করেছি। কিন্তু সে আমাকে যা দিয়েছে তার মূল্য অনেক বেশী। সেই খান্টা ছিল তার একমাত্র সম্পদ। ঐ খান্টার মত খান্টা সারা দেশে আর নেই। ওর বাবা ছাড়া কেউ তৈরী করতে জানে না, আর ঐ ধরনের রবার সে আর কোথাও পাবে না...।

৪৫২। ছোট খেলোয়াড়

আমার সার্কাস দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। শুক্রবার সকালে সার্কাসের মাঠে গেলাম। খেলোয়াড়দের মধ্যে নাকি আমার মত দশ বছরের একটা ছেলে ছিল। সে ঘোড়ার উপর দাড়িয়ে দ্রুত বেগে তাকে ছুটাতে পারত, আর দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াত।

আমার ভাগ্য ভাল। ছেলেটা ঘোড়া আঁচড়াচ্ছিল। বললাম.

- তোমার নাম কি ?
- পলাশ, আমি মালিকের ছেলে।
- তুমি স্কুলে যাও ?
- যাই। বর্ষা শুরু হলে প্রতি বছর যাই। এই সময় তো পারি না। এখন আমার অনেক কাজ।
- কি কাজ কর ?
- চার-চারটে ঘোড়া আঁচড়াতে হয়, খাওয়াতে হয়, তাদের জন্য পানি আনতে হয়, তাদের পরিস্কার রাখতে হয়। প্রত্যেকদিন সার্কাসের দড়িগুলো চেক করতে হয় ঢিলা আছে কি না বা ছেঁড়া আছে কি না। বিকাল বেলা একবার দুবার করে প্রত্যেকটি খেলার রিহার্সেল দিতে হয়, ভাইবোনকেও শিখাতে হয়, কারণ একদিন আমার অসুখ হতে পারে, দড়ি থেকে পড়ে যেতে পারি... তখন আমার পরিবর্তে অন্য কেউ খেলবে। আরও নতুন নতুন খেলা শিখতে হয়, না হলে লোকে বিরক্ত হয়ে যায়।

• পলাশ, তুমি খুব সুন্দর করে হাসতে জান।

• তা জানি, কিন্তু এসো, আমার ভাইবোনদের দেখে যাও। তাদের হাসি আরও সুন্দর।

পলাশ আমাকে নিয়ে গেল তার চাকাওয়ালা ছোট ঘরের সামনে। তার ভাইবোনেরা বানরদের মত লাফালাফি করতে জানে, ডিগবাজি খায় আর শরীরটাকে এমনভাবে বাঁকাতে পারে যে, মনে হয় শরীরে তাদের কোন হাড় নেই, আর তারা উপরের দিকে পা তুলে হাত দিয়ে হেটে বেড়াতে পারে। পলাশ আমাকে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ালো, শেষে ঘরে ফিরে এসে তার মায়ের কোলে আর এক ছোট ভাইকে দেখালো... আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, পলাশ তো শুধু খেলোয়াড় নয়। তার বাবা আছে, তার মা আছে তার ভাইবোন আছে, সে স্কুলে যায়, সে হাসে আর কাঁদে অন্যান্য সব ছেলেমেয়েদের মত...। শেষে পলাশ আমাকে একটা খান্টা দেখাল । বলল, এর মত খান্টা সারা দেশে আর নেই , বাবা ছাড়া আর কেউ তৈরী করতে জানে না, আর এই ধরনের রাবার কোথাও পাওয়া যায় না। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। সত্যিই তো!

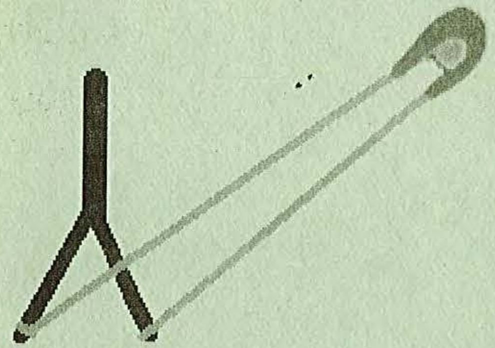

আমার গুলি এত দূরে চলে গেল যে, কোথায় পড়ল তা চোখে দেখতে পারিনি। আমার খুব লোভ হল, ঐরকম খান্টা জীবনেই দেখিনি।

'যাবার সময় বললাম,আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সার্কাস দেখতে চায়। টাকা নেই বলে আসতে পারে না । পলাশ বলল, আমি বাবাকে বলে ব্যবস্থা করব যেন অর্ধেক দামে টিকেট পায়। পরের দিন দুটো ক্লাস অর্ধেক দামে সার্কাস দেখতে এল। পলাশ এত নিপুণ খেলা দেখাল যে, সব ছেলেমেয়েরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল। আমি কিন্তু শেষে পিছনের দিকে চেয়ে দেখলাম। আমাদের ছাড়া খুব বেশি লোক আসেনি। চার ভাগের তিন ভাগ বেঞ্চ খালি ছিল। মনে মনে ভাবলাম, গাড়ী, ঘোড়া, সামিয়ানা, খেলোয়াড়দের খাওয়া দাওয়া, জায়গার ভাড়া এসব ওরা দেবে কোথা থেকে ? বাড়ী যাবার পথে বাবাকে বললাম, আব্বা, ওদের খেলা খুব সুন্দর! দর্শকদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য কিছু করা যায় না ? বাবা বলল আমি ঠিক তাই ভাবছিলাম। এক কাজ কর, তুমি একা বাড়ী যাও, আমি এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

বাবার বন্ধু ফটো তুলত। পরের দিন সকালে পলাশের কাছে গিয়ে তাকে ঘোড়া ছুটিয়ে তার পিঠে দাঁড়াতে বলল, সেই অবস্থায় তার ফটো তুলল। রাত্রে ফটোটি খবরের কাগজে ছাপানো হল। তার সঙ্গে বাবার একটা প্রবন্ধ। আমি পলাশের সঙ্গে যা আলাপ করেছিলাম,যা দেখেছিলাম তাতে সব লেখা ছিল।

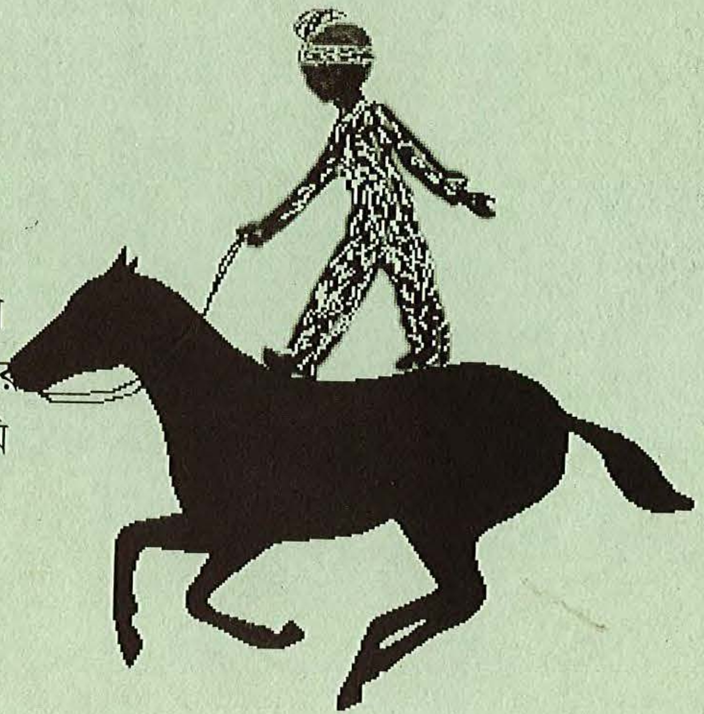

সব ছাত্ররা অপুকে ভালবাসত, সবাই তার দুঃখের ইতিহাস জানত, কারণ একটা ছোট গ্রামে কারও খবর গোপন থাকেনা। অপুর নাম শুনে সবাই হাততালি দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। শেষে হেডমাষ্টার বলল, আমি প্রস্তাব করছি, সবাই মিলে তাকে বাড়ীতে পৌছে দিই। ওর বাবাকে বলব, সে তার ছেলেকে নিয়ে গর্ব করতে পারে।

দু'শ ছাত্র অপুর পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করল। তাদের হৈ চৈ শুনে গ্রামের লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কি? শুনে আরও অনেকে তাদের সঙ্গে গেল। হেডমাষ্টার সাহেব মনি মিস্ত্রির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, মনি বাবু, আপনার ছেলে অপু এই সকল ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, সেজন্য আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অপুকে নিয়ে আপনি গর্ব করতে পারেন। নেন, এইটা হল তার পুরষ্কার।

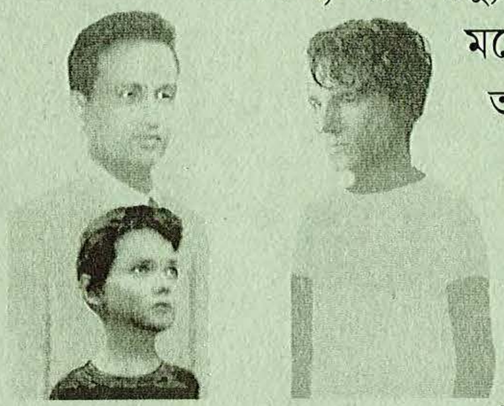

ছাত্রেরা আবার হাততালি দিতে লাগল। মনি মিস্ত্রি তার ছেলের সামনে একটা মূর্তির মত দাড়িয়ে রইল। অপুর গালে তিনদিন আগের চড় এখনও মুছে যায়নি। কথা বলতে গিয়ে পারল না। গলা ধরে এল। শেষে চোখের পানি লুকাবার জন্য কারখানায় ঢুকে পড়ল।

বইটা খুলে পেল অপুর পরীক্ষার কাগজ। বসে বসে অপুর কাগজ পড়তে লাগল। দু'ঘন্টা ধরে কি করল তা কেউ জানে না। কিন্তু সেদিন থেকে অপুর মুখে আর কোন দাগ দেখা যায়নি। অপুর চোখে হাসি ফিরে এল, তাদের বাড়িতেও আনন্দ ফিরে এল।

৪৫৩। অপুর দুঃখের দিনগুলি

অপুর বাবা এক সময় খুব ভাল কাঠমিস্ত্রি ছিল। সবাই জানত যে, তাকে একটা লাঙ্গল তৈরী করতে বললে, লাঙ্গলটা সময় মতই পাওয়া যাবে, লাঙ্গলটা হবে মজবুত, তাতে কোন খুঁত থাকবেনা, দাম এক মাস পরে দিলেও সে কোন আপত্তি করবে না। মনি মিস্ত্রির তিনটি ছলেমেয়ে। সুন্দর, ভদ্র, বাচাল। তাদের ভাষা বইয়ের ভাষার মত, কারন মা যশোর শহরের ভদ্র পরিবারের মেয়ে।

মনি মিস্ত্রি রসিক স্বভাবের মানুষ। তার অনেক বন্ধু-বান্ধব। তাদের মধ্যে দু-একজন খুব বদ। তারা মদ খায়, মনি মিস্ত্রিকেও খেতে দেয়। সময় সময় মনি মিস্ত্রি মাতাল হয়ে বাড়ী আসে।

এক সময় কিন্তু মনি মিস্ত্রি ঘন ঘন মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরতে লাগল। তার স্ত্রী নালিশ করলে, সে মারে। তার কাজ আগের মত ঠিক সময় শেষ হয় না। তখন অপুর বয়স দশ বছর। স্কুল থেকে ফিরে এলে, বাবা তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকে, ঠিকমত রানদা টানতে না পারলে, মারে।

অপু রাত আটটা-ন'টার সময় কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন স্কুলের পড়া শুরু করে। কিন্তু বারবার বই খাতার উপর ঘুমিয়ে পড়ে। মা যখন খাবার জন্য জাগিয়ে তোলে তখন অপু এত ক্লান্ত যে না খেয়েই শুয়ে পড়ে। এদিকে বাবা যা যা আয় করে তা মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। সময় সময় রাত্রে খাবার জোটেনা। অপুর জামা-কাপড় এত ছেঁড়া যে, মা সেলাই করে আর পারে না। একদিন বাবার কাছে নালিশ করতে গিয়ে এমন একটা চড় খেল যে, তার চিহ্ন অনেক দিন থেকে গেল। মনি

মিস্ত্রির হাত কাঠের মত শক্ত। স্কুলে অপুর সাথীরা জিজ্ঞাসা করে, অপু, তোর জামা এত ছেঁড়া কেন রে ?

- ভাল জামাটা ধুইয়ে দিয়েছি, এখনও ভিজে রয়েছে।
- অপু, তোর মুখেওটা কিসের দাগ রে?
- পড়ে গিয়েছিলাম.....গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছি।
- আমি জানি, ওর বাপ মেরেছে। ওর বাবা মাতাল তাই মারে....।
- মিথ্যা কথা ! মিথ্যা কথা !
- সত্যি কথা ! সত্যি কথা !

আমি নিজের চোখে দেখিনি ?

অপু গত বছর খুব ভাল ছাত্র ছিল। তার খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার বই চক্‌চকে, তার বাড়ির কাজ এত নিখুঁত যে, বার বার স্যার অন্য শিক্ষকদের দেখিয়ে গর্ব করত। এই বছরে তার অবনতি হয়েছে। পাস করা ছাড়া আর কোন আশা করতে পারবে না।

একদিন স্যার বাড়ী যাবার পথে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করল। মা সব কিছু বলল। স্যার চুপ করে চলে গেল। পরদিন হেডমাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করল। পরের সপ্তায় বছরের প্রথম পরীক্ষা। হেডমাস্টার নিজে এসে ছাত্রদের একটা কাগজ দিল ও নিজ নিজ নাম লিখতে বলল। পরীক্ষা শেষ করতে দু'ঘন্টা সময় দিল। অপু আগে অঙ্ক ও ইংরেজী দেখল। কঠিন কিছু পেল না। দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করল। শেষে বাংলা রচনা লিখতে শুরু করল। টাইটেল ছিল, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন। তার বেশী চিন্তা করতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে লিখতে শুরু করলঃ- "গত বছর আমার দাদী মারা গেছে। দাদী আমাকে খুব ভালবাসত, আর আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। আমি তাকে আর দেখতে পাব না, সে আমাকে আর গল্প শুনাতে পারবে না, এই চিন্তা

করে আমি সারাদিন কেঁদেছিলাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন সেটা নয়। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন হল যখন বাবা অন্য রকম হয়ে গেছে। একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে এল, তার চেহারা অন্য রকম। মা জিজ্ঞাসা করল, চাউল এনেছ ? তখন হঠাৎ তার চোখ লাল হয়ে গেল, তারপর একটা বেত দিয়ে মাকে মারতে শুরু করল।

সেদিন আমি কাঁদিনি। বাবা যদি মারা যেত আমি কাঁদতাম। কিন্তু সেদিন আমার দুঃখ এত বেশী হল যে, আমার চোখ থেকে পানি বের হতে পারল না। এখনও পানি বের হতে পারে না, কারণ বাবা আর কোন দিন আগের মত হবে না। আমাদের বাড়ীতে আগে হাসি ছিল, কান্না ছিল, গান ছিল। এখন আর হাসি নেই, কান্নাও নেই, গানও নেই, কারণ বাবা আর আমাদের ভালবাসে না। মাকেও ভালবাসে না, কাউকে ভালবাসে না। সেজন্য আমি সেদিন থেকে আর কোন দিন কাঁদতে পারিনি, হাসতেও পারিনি। এটা হল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখের দিন..." অপু এইটুকু লিখে কাগজটা স্যারের কাছে জমা দিয়ে বাড়ী চলে গেল। পরের দিন স্কুলের শেষে হেডমাস্টার সাহেব সব ছাত্রদের স্কুলের মাঠে ডাকল। তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষার কাগজ সবাইকে ফিরিয়ে দিল। হাতে রাখল একটা মাত্র কাগজ। বলল, তোমাদের পরীক্ষার ফল দেখে আমি খুশী হলাম। অনেকে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছিল। তবে তোমাদের একজন এই তিন মাসের মধ্যে অন্যের চেয়ে বেশী বাধা ও কষ্ট সহ্য করে খুব উন্নতি করেছে। সে একশ নম্বরের মধ্যে একশই পেয়েছে। পুরস্কার হিসাবে আমি নিজে বাজারে গিয়ে তার জন্য এই সুন্দর বই কিনে এনেছি। এই তিনশো পৃষ্ঠার বইতে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে পরিচিত জ্ঞানী-গুণী মানুষের জীবনের কথা লেখা আছে। হয়তো একদিন বইটির শেষ পৃষ্ঠায় আর একজনের নাম লেখা হবে, সে হল অপু কুমার হালদার।

• ঠিক আছে, তুমি কান লাগিয়ে শুনতে থাক। আমি ফুলতলা স্টেশনে ফোন করে আসি।

পাঁচ মিনিট পরে শব্দ থেমে গিয়েছিল। ফুলতলার স্টেশন মাষ্টার পরিদর্শন করে রেল লাইন তেমন কোন ত্রুটি পায়নি। বাবা আবার তাদের অনুরোধ করেছিল যেন লাইনের উপর কড়া নজর রাখে।

আজ নির্মল যেতে যেতে রেল লাইনের প্রত্যেকটি নাট-বোল্ট চেক করে দেখে। লাইনের পাশে যদি কোন পায়ের চিহ্ন দেখে, সেখানে বিশেষ ভাবে খোজে লাইনের কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা।

এবার একশো আটান্ন কিলোমিটারের খুঁটি পেরিয়ে গেছে। তার কর্তব্যের সীমা এ পর্যন্ত। সন্ধ্যা নেমে আসছিল। নির্মল ফিরে আসার পথ ধরল। হঠাৎ তার মনে একটা সুর ভেসে উঠল।

• এমন একদিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে ... মনে রেখ। এমন একদিন আসতে পারে...

নির্মল রেল লইনের গায়ে কান পাতল ..।

হঠাৎ তার কানে আসল নাড়াচাড়া ও ঘষাঘষির শব্দ। বেশী দূরে নয়, এক-দুই কিলোমিটার দূরে হতে পারে। উত্তরের দিকে চেয়ে দেখল। অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না... ভাবল, আমার কর্তব্য আমি ঠিকমত করেছি তো! ...

কিন্তু আবার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে সেই সুর ভেসে উঠল, নির্মল, হয়ত তুমি এর চেয়ে ভাল কাজ করতে পারতে....এমন একদিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে।

তাই তো! ওরা যদি সত্যি সত্যি রেল লাইনটা নষ্ট করে থাকে! আমাকে দেখতে হবে! নির্মল উত্তরের দিকে দৌড়াল। দ্রুত বেগে দৌড়াল...

৪৫৪। নিপুন কাজ ১

• স্যার, কেন আমাকে পাঁচ নাম্বার দিয়েছেন?

• আমি একটা ইতিহাসের ঘটনা লিখতে বলেছিলাম, তুমি লিখেছ একটা গল্প। তোমার ঘটনা ঘটেছে ১১২২সালে, আর তুমি লিখেছ ১১১০। গল্প হিসেবেও তোমার লেখাটা ভাল নয়। তুমি লিখেছ, ছেলেরা পার্বণ উপলক্ষে নতুন প্যান্ট পরেছিল ও ছোট মেয়েরা মায়ের শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকত। ১১১০ সালে ছেলেরা প্যান্ট পরত না, আর ওখানকার মেয়েরা কোনদিন শাড়ী পরেনি।

• স্যার, আমি ভাবিনি যে, একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য এত খুঁটিনাটি ভাবতে হয়।

• কেন, সত্য আর মিথ্যা তোমার কাছে সমান না কি? তুমি এসব মিথ্যা লিখতে গেলে কেন? মিথ্যা কথার চেয়ে মিথ্যা লেখা আরও খারাপ।

• স্যার, আমি জানতাম না এটা মিথ্যা। আমি ভাবছিলাম...

• ইতিহাসের কথা ভাবতে হয় না, জানতে হয়। লাইব্রেরীতে ইতিহাসের অনেক বই আছে। সেগুলো দেখা উচিত ছিল। একটা কাজ শুরু করলে শেষ করতে হয়। অর্ধেক কাজ কোনদিন করতে নেই।

• আমি যা পারি, তাই করেছি স্যার।

• নির্মল, তুমি যা পার , তা কি সব করেছ? এমন একদিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে, মনে রেখ।

নির্মল বাড়ী গেল । শরীফ স্যারের উপর তার খুব রাগ। ভাবছে, আমাকে কি পেয়েছে সে? আগামীবার তাকে দেখাব কি করতে পারি!

পরের বারও কিন্তু নির্মল ছয় নাম্বারের উপরে উঠতে পারলনা। স্যার বলল, উপনিষদ কথাটা চার বার ভূল লিখেছ , কোন সন্দেহ করনি?

• করেছি স্যার , কাছে ডিকশনারী ছিলনা, তাই ....

• নির্মল, এই পাপের জন্য আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করতে পারেন, আমি তো না। একটা কাজ ধরলে নিপূন ভাবে চালাতে হয়। অর্ধেক কাজ কোনদিন করতে নেই... এমন একদিন আসতে পারে যখন...

সেদিনও নির্মল শরীফ স্যারের উপর খুব রাগ করল।

সেদিনও ভাবল, আমাকে সে কি মনে করে? আমি তাকে দেখাব, কি করতে পারি ! শরীফ স্যার তার দু'চোখ দেখে বুঝল তার মনের কথা। তবু কোন সান্তনা দিল না, কোন মায়াও দেখাল না।

সেদিন থেকে কিন্তু নির্মলের খাতায় অনেক নয় ও দশ পড়তে লাগল। শরীফ স্যারের উপর নির্মলের যে রাগ ছিল সে রাগ আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গেল। তার পরিবর্তে কাজের আনন্দ বাড়তে লাগল, নিপুন কাজের আনন্দ। যা পারি তাই করেছি, এমন কথা তার মুখ থেকে আর কোন দিন বের হল না। তার উত্তর সে জানে : নির্মল, তুমি যা পার, তা কি সব করেছ ?... এমন একদিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে...মনে রেখ।

কয়েক মাস পরের কথা। একদিন বিকালবেলা বাবা ডাকল। নির্মল যখন স্কুলের কাজ করে তখন বাবা ডাকে না, কাজ যত জরুরী হোক না কেন। সেদিন কিন্তু বাবা ডাকল।

ছোট রেলওয়ে ষ্টেশনে বাবা ছিল স্টেশন মাষ্টার। তার অধীনে দুজন কর্মচারী টিকিট বিক্রি করত ও রেল লাইন দেখাশোনা করত। কয়েক মাস আগে থেকে তাদের কাজ খুব বেড়ে গেছে। সন্ত্রাসীদের একটা দল

হুমকী দিয়েছিল, সরকার যদি সেই এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত না করে, তবে তারা রেল চলাচল বন্ধ করে দেবে।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পর পরই, ঘন্টায় একশ কিলোমিটার বেগে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন যায়। যাবার একঘন্টা আগে দু'জন কর্মচারী তাদের লাল নিশানা বগলে করে রেল লাইন পরিদর্শন করতে যায়। রেল লাইনে কোন অসুবিধা দেখলে তারা নিশানা উঁচু করে ট্রেন থামায়। তাদের দেখাশোনার এলাকা ছিল ষ্টেশনের পূর্ব দিকে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত।

• নির্মল, সুভাস বাবুর অসুখ করেছে, রেল লাইন পরিদর্শনের জন্য তোমার বের হতে হবে। কি করতে হয়, তুমি জান। চোখ খোলা রাখ। নাও, টর্চলাইট ও নিশানাটা নিয়ে যাও। নির্মল বের হল। সে অনেক বার সুভাস বাবুর সঙ্গে রেল লাইন দেখতে গেছে। কি দেখতে হয় সে জানে। সুভাস বাবু সব সময় বলে, নির্মলের আছে বিড়ালের মত চোখ, এক মাইল দূর থেকে একটা ইঁদুর দেখতে পায়। গত সপ্তায় একদিন সে সুভাস বাবুকে বলেছিল:

• ঐ দেখুন সুভাস বাবু, ঐ কয়েকটা নাট-বোল্ট দেখতে যেন কেমন লাগে। সুভাস চমকে উঠেছিল,

• কই দেখি... সত্যিই তো... এই কয়টা নাট খুব ঢিলা ! একটা সাধারণ রেঞ্চ দিয়ে যে কোন লোক এগুলো খুলে ফেলতে পারে। আর দেখ, হাতুড়ি আর ছেনী দিয়ে নাটগুলো ঢিলা করে রাখা হয়েছে। শীঘ্র দৌড়াও, বড় রেঞ্চ আর হাতুড়ি ও ছেনি নিয়ে এস...। সে দিন থেকে নির্মল দিনে বা রাতে যখন তখন রেল লাইনের গায়ে কান লাগিয়ে শুনতে লাগল, কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা। গতকাল দুপুরের পর বাবাকে ডেকেছিল, বাবা এস তাড়াতাড়ি ! রেলপাটিতে কান লাগাও ! এই শব্দ আমার ভাল মনে হচ্ছে না। উত্তর দিক থেকে আসছে। উত্তর দিকে যত সরে যাই তত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে রেল লাইনে কি কাজ হচ্ছে বলতে পার?।

৪৫৫। নিপুন কাজ ২

নির্মল উত্তরের দিকে দৌড়াতে লাগল। সময় বেশী নেই। ট্রেন আসবে দশ মিনিটের মধ্যে। হঠাৎ দেখল... ঠিকই তো ! রেললাইনের উপরে এক কিলোমিটার দূরে একটা বাতি জ্বলছে!। সঙ্গে তিন-চারজন লোকের ছায়া। ওরা কারা? রেললাইনের লোক না অন্য কেউ? জানতে হবে। আবার দৌড়াল .... হঠাৎ এক ঝোপের আড়াল থেকে লম্বা-চওড়া একজন লোক বের হয়ে তার পথ রোধ করল,

- থাম। যাচ্ছ কোথায় ?
- আমি রেল লাইনের লোক। সড়! ওরা কি করছে আমার দেখতে হয়...
- থাম, নয়তো গুলি করব... ওখানে বসে পড়, এক পা নড়লে তোমার জান শেষ!

নির্মল সব বুঝতে পারল। ওরা রেল লাইন খুলছে আর এই লোকটা পাহারা দিচ্ছে। নির্মল ভাবল, পালাতে হবে, তা না হলে ট্রেনটা থামাতে পারবে না পাশের ঝোপের মধ্যে দিয়ে পালাতে হবে। নির্মল জায়গাটা চেনে নিজের বাড়ীর মত। মাটিতে বসে চেয়ে রইল দক্ষিণের দিকে, কখন ট্রেনের আলো দেখা দেবে। তখন পালাতে পারলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে। পাঁচ মিনিট কেটে গেল । তার পাহারাদারের মনযোগ কমতে লাগল। যখন ট্রেনের আলো দেখা দিল তখন লোকটি আলোর দিখে চেয়ে রইল। নির্মল ঠিক তাই চাচ্ছিল। এক লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্য দিয়ে পালাতে লাগল। লোকটি গুলি মারল, এক বার, দুই বার ততক্ষণে নির্মল বেশ দূরে চলে গিয়েছিল। নির্মল কোন ব্যথা টের

পেলনা। কিছুদূর গিয়ে কিন্তু সে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার চোখে ঘুম আসল। ভীষন ঘুম। এখন সে ঘুমাবে, সারা রাত ঘুমাবে... কিন্তু ট্রেনের শব্দ তার কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তার কানে এলো সেই সুরঃ- নির্মল, এমন একদিন আসতে পারে যখন তোমার চেষ্টার অভাবে... নির্মল পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেল। ভীষন কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে রেল লাইনের দিকে উঠতে লাগল... নিশানাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে কিন্তু এখনও তার হাতে রয়েছে। যখন নির্মল রেল লাইনে পৌছাল তখন ট্রেনের দু'টি চোখ কাছে এসে গেছে। নির্মল ডান হাতে লাল নিশানটা ধরে অসম্ভব কষ্টে হাঁটু গেড়ে বসল ও লাল নিশানটা নাড়াতে লাগল। এক বার, দু'বার ... দশ বার। ট্রেনের দুটি চোখ এসে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। ব্রেকের শব্দে তার কান ফেটে যাচ্ছিল... শেষে চাকাগুলোর গতি কমে গেল, তারপর থেমে গেল। তখন নির্মল ঘুমিয়ে পড়ল... নির্মলের ঘুম আর ভাঙল না। ডাক্তার সারা রাত তাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করল। বলল, ছেলেটা যেখানে গুলি খেয়েছিল সেখানে যদি শুয়ে থাকত তাহলে হয়ত তাকে বাঁচানো যেত। সারা রাত

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে লাগল। কাকে যেন বলছিলঃ- তোমার চেষ্টার অভাবে অনেক মানুষ মরে যাবে, মনে রেখ... শরীফ স্যার তার বাংলা শিক্ষক ভোর বেলায় খবর পেয়ে নির্মলকে দেখতে এল। সে তার কথার অর্থ বুঝতে পারল...। নির্মল সকাল আটটায় মারা গেল । ট্রেনে এক হাজার যাত্রী ছিল। কারও কোন ক্ষতি হয়নি। নির্মল যদি ট্রেন না থামাত তবে কম পক্ষে দু'শ-তিনশ লোক মারা যেত।

৪৫৬। মমতা

ষ্টেশন পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। তারা কাজ করে। কাঠকুটো কুরিয়ে আনে, ডাষ্টবিন ঘেটে জিনিসপত্র কুড়ায়, ইট ভাঙ্গে, বাজারে আর ষ্টেশনে কুলিগিরি করে বেঁচে থাকার একটা উপায় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে পাঁচ দশ টাকা বাড়ীতে নিয়ে আসে। এক সময় পাড়াটির মাঝখানে একটা ডোবা ছিল। একদিন একটা ট্রাক এসে মাটি দিয়ে ডোবাটা ভরে দিল। তার উপর একটা গোলপাতার ঘর উঠানো হল, তারপর যে সব ছেলেমেয়ের বয়স সাত বছরের বেশী, তাদের বলা হল, এস, লেখাপড়া শেখার উপায় করে দিচ্ছি। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তোমরা আপার কাছে পড়বে। এগারোটার পরে তোমরা যা খুশি তাই করবে। তোমাদের পেশার কোন ক্ষতি হবে না।

জাকির সকাল আটটায় স্কুলে যায়। এগারোটায় স্কুল থেকে বের হয়। তখন একটা ছোট বাক্স ঘাড়ে ঝুলিয়ে, আধাঘন্টা পথ হেটে একটা হাই স্কুলের সামনে গিয়ে বসে। দুপুরে ছাত্ররা টিফিনের জন্য বের হয়। এই স্কুলে পড়তে হলে অনেক ফি দিতে হয়, সুন্দর জামা পড়তে হয়, পরিষ্কার জুতাও পড়তে হয়।

জাকির জুতা পালিশ করার বাক্স নামিয়ে রাখে। ভিতরে সব রকমের কালি, ক্রীম, বার্ণিশ আছে, তিনটা আলাদা ব্রাশ আছে, কয়েকটা আলাদা নেকড়া আছে, এমন কি একটা লোহাও আছে। ছোট হাতুড়ি ও পেরেক আছে, সেলাই করার সুঁই ও নাইলন সুতা আছে, দশ পনেরোটা রিপিট আছে। ব্যবসার সব কৌশল সে আয়ত্ত করেছে। ছেলেমেয়েদের মুখ দেখে বুঝতে পারে, কার কাজ বাকী করলে সে ঠকবে না, ও কার

কাজ নগদ করতে হবে। পালিশ করতে সে এক টাকা করে নেয়। জুতা বড় হলে দুই টাকা। প্রত্যেক দিন বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ করে, পনেরো-বিশ টাকা আয় করে। তা থেকে জিনিসপত্র কেনার জন্য পাঁচ টাকা রাখে, বাকী টাকা মায়ের হাতে দেয়।

আজ টিফিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, জাকির বাক্স বন্ধ করে ঘাড়ে ঝুলিয়ে ছাত্রদের ভীড় ঠেলে চলে যাচ্ছে। কিন্ত হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠেঃ আমার টাকা পড়ে গেছে! আমার টা-কা! পকেটে একটা ছিদ্র ছিল, আমি বুঝতে পারি নি! সব টাকা পড়ে গিয়েছে! এই দেখ, কিচ্ছু নেই। মা আমাকে কি বলবে!

• বেচারা! শুনলে তো, ওর টাকা সব পড়ে গিয়েছে। ছেলেটার বাবা নেই। ওর দুটো ভাইবোন আছে, হয়ত আজ না খেয়ে থাকতে হবে।

• আমরা কি করতে পারি! এখন তো আর টাকা খুঁজে পাওয়া যাবে না!

• পাওয়া যাবে না মানে?... শোন, আমার একটা টাকা আছে, এই নাও, কার পকেটে টাকা আছে, বের কর।

• আমার আছে পঞ্চাশ পয়সা। এই নাও।

• আমার এক টাকা আছে, নাও।

• আমারও এক টাকা আছে, এই নাও, কত হলো?

• সাড়ে তিন টাকা। আরও দরকার। এই, ক্লাস এইট! যার পকেটে টাকা আছে দাও। জাকির, এস, আমরা তোমার বাকী টাকা যোগাড় করে দেব...।

আমেনা পাঁচ মিনিটের মধ্যে পঁচিশ টাকা যোগাড় করে নিয়ে আসল,

• এই নাও জাকির, পঁচিশ টাকা হয়েছে, গুনে নাও!

• আপা তুমি খুব ভাল! সারা বছর বিনা পয়সা তোমার জুতা পালিশ করে দেব... আর আপা... তোমার বিয়ের দিন আমাকে ডাকবে। আমি তোমার বর ও বরযাত্রীদের জুতা ফ্রি পালিশ করে দেব!

৪৫৮। ঈমান

আমেনার বয়স ১০ বছর। তার বাবা রীতিমত নামায পড়ে না। শুধু মাঝে মাঝে আল্লার কাছে মোনাজাত করে ও শোকরিয়া জানায়।

যেমন বাপ তেমন মেয়ে। সেদিন আমেনা বই পড়তে বসেছিল। ছোট ভাই বার বার খাতা ধরে টানছিল। আমেনা রাগ করে তাকে একটা চড় মারল। সে কেঁদে ফেলল। এমন সময় আযান পড়ল। মা নামাযের জন্য আমেনাকে ডাকল। আমেনা গেল না। নামায সেরে মা বলল, আমেনা, আমি ডাকলাম, আসলে না কেন? আমেনা বলল, আমি ছোট ভাইকে মেরেছি। আল্লাহ আমার নামায কবুল করবে না।

একদিন বাবা-মা কালু মিয়ার কথা আলোচনা করছিল। সে সুদ খেয়ে বড় লোক হয়েছে। আমেনা সব শুনছিলো। পরের দিন কালু মিয়া টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে যাচ্ছিল। আমেনা ছুটে গেলো। বলল, চাচা, আপনি নামায পড়েন কেন? সুদ খেলে কি নামায হয়?

কালকে আমেনার মাথা ধরেছিলো। মায়ের সাথে নামায পড়তে গেল না। মা বলল, নামাজ না পড়লে আল্লাহ দোযকে ফেলে দেবে।

আমেনা হাসল। বলল, মা, আল্লা জানে আমার মাথা ধরেছে! এছাড়া তো আল্লাহ আমাকে ভালবাসে, তাহলে সে আমাকে দোযকে ফেলবে নাকি !

৪৫৭। রাত্রে কাজ

স্বপন আজ স্কুল থেকে মার্ক -শীট নিয়ে আসল। সে ইংরেজী ও বাংলায় ফেল করেছে। তিন মাস আগেও পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি। এবার যদি সে খুব চেষ্টা না করে তবে ক্লাস সেভেনে উঠতে পারবে না। মা কিছুদিন মার্ক-শীট গোপন করে রাখল। বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না, উপরন্তু পৌরসভায় তার চাকুরী থাকবে কি না সন্দেহ। চারজন ছেলেমেয়েকে কি করে খাওয়াবে, পরাবে, এই চিন্তায় সে অস্থির। চেয়ারম্যানের কাছে মাইনা বাড়াবার জন্য দরখাস্ত করেছে, কোন উত্তর পায়নি। চেয়ারম্যান সাহেব অন্যের মারফতে তাকে জানিয়েছে, মাইনা যদি না পোষায় সে চাকুরী ছেড়ে দিতে পারে, পৌরসভার কোন লোকসান হবে না, তার এই চাকুরী করার জন্য এক হাজার লোক বসে আছে। তখন বাবা বাড়ীতে করার মত একটা উপরি কাজ যোগাড় করেছে। একটা স্থানীয় ছাপাখানায় ভুল শোধরানোর কাজ নিল। তাতে রোজ তিন/চার ঘন্টা কাজ করলে তার কিছু টাকা হত। এই কাজ কিন্তু বেশ কঠিন। পুরো মন দিয়ে করতে হয়। সেইজন্য তার স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে যেতে লাগল। আজ সন্ধ্যায় বাবা পৌরসভা থেকে ফিরে এল। তার শরীর খুব ক্লান্ত। তার মন আরও ক্লান্ত। জিজ্ঞেস করল, স্বপন কই? মা উত্তর দিল, গাছতলায়, ভাইবোনকে পড়াচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে এস, চা দিচ্ছি।

- শুনছি সবাই পরীক্ষার ফল পেয়েছে... স্বপন পায়নি?
- পেয়েছে... এই নাও তোমার চা।

আমি কাগজটা খুঁজে নিয়ে আসি... আসলে তার পরীক্ষা ভাল হয়নি। এমনি তোমার চিন্তা-ভাবনা অনেক, তাই আমি বাড়াতে চাইনি।

• ঐ ছেলেটার কি হয়েছে আমি বুঝতেই পারছি না। গত বছর হেডমাষ্টার বলতেন, ওর মত ছাত্র তার স্কুলে আর নেই। আমি নিজে সবার সামনে কত গর্ব করেছি! আর এখন মুখ দেখাতে পারছি না...।

• দুঃখ কর না, আমার সোনার ছেলে ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে আর কি... ডাক্তার বলেছে, এইটা তার বেড়ে ওঠার বয়স, কিছু না কিছু তার হবেই।

• তাই বলে স্কুলের সময় সে ঘুমিয়ে পড়বে আর আমি চুপ করে থাকব? হেডমাষ্টার সাহেব আজ আমাকে ডেকেছে। এই ছয় মাস ধরে স্বপন বার বার ক্লাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ডাক, ওরে! স্বপন! স্বপন!... তুমি নাকি ইংরেজী আর বাংলায় ফেল করেছ? আর তুমি নাকি ক্লাসের সময় ঘুমাও? তোমার লজ্জা করে না?

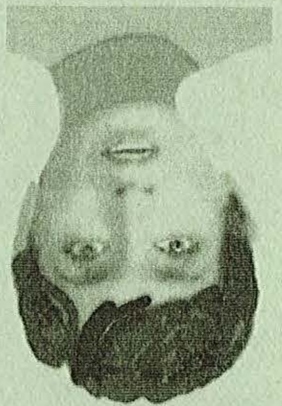

• আর হবে না আব্বা।

• আমি তোমাদের জন্য দিন রাত খেটে মরি, তোমার ভাইবোনদের মানুষ করার জন্য তোমার উপর আমার এত আশা ছিল... তুমি সব মাটি করে দিলে... তোমার দ্বারা কিছু হবে না!... স্বপন চলে গেল। তার চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি পড়ছিল।

বাবার মুখ আরও কিছু দিন আষাঢ় মাসের আকাশের মত হয়ে রইল। কিন্তু একদিন সকালে স্বপন আশ্চর্য হয়ে গেল। বাবার মুখে রাগ বা দুঃখের কোন চিহ্ন নেই। মায়ের মুখেও হাসি ফুটেছে। নাস্তা খেতে গিয়ে দেখল, তার প্লেটে রুটির পরিবর্তে চারটি পরটা। সে কিছু বুঝতে পারছিল না.... ঈদের দিনেও মা এত খরচ করে না...।

রাত্রে খাবার সময় বাবা, মা, ছেলেমেয়েরা থালায় হাত দিতে যাচ্ছিল, এমন সময়...

• স্বপন, এই নাও, তোমার জন্য এই নতুন জামা এনেছি।

• ও! আব্বা!

• গত ছয় মাস ধরে তুমি প্রতি রাতে ঐ সব কাগজ শোধরাতে আমাকে সাহায্য করেছ, আর আমি বুঝতে পারিনি, কারণ তোমার হাতের লেখা আমার হাতের লেখার মত। কিন্তু গত রাত্রে আমি টের পেয়েছি। তুমি যখন কাজ করছিলে, তখন আমি তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুরো দু'ঘন্টা তোমার পিছনে ছিলাম......।

• আব্বা, তুমি বেশী কাজ কর, তোমার অসুখ হবে, আমি তা চাই না!

• চুপ কর! আমি দু'ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আল্লার কাছে শুকরিয়া জানিয়েছি যে, তোমার মত ছেলে আমার আছে। শুধু কি তাই...? আজ সারাদিন অফিসে বসে সবার কাছে তোমাকে নিয়ে গর্ব করেছি...। এবার কিন্তু শোনঃ- যদি আবার কোনদিন রাতে আমার ঐ কাজ করতে যাও, তবে পিঠে মোটা একটা ছালা বেঁধে যেতে হবে। তা না হলে তোমার ভাল হবে না বলে দিচ্ছি...। আমি...

বাবার কথা শেষ হল না, কারণ তার গলা ধরে আসল ও তার চোখে পানি এল। ঠিক সেই সময় ছোট বোন স্বপনকে আলিঙ্গন করতে এলো। এই ছয় মাস স্বপন বাবা-মায়ের মুখে একটা ভাল কথা শুনতে পায়নি। এবার তার এতদিনের কষ্ট এক মুহূর্তে মুছে গেল।

শেষ করে মামার বাড়ী এলাম। বাস থেকে নেমে রিক্সাওয়ালাকে বললাম, উমা বুবু যেখানে বাদাম বেচে সেখানে যাবেন। এই পাঁচ টাকা ভাড়া নেন, আমাকে একটা সিকি ফিরিয়ে দিতে হবে কিন্তু। তিন বছরের মধ্যে আমি বড় হয়ে গিয়েছিলাম। কেউ আমাকে চিনতে পারছিল না। উমা বুবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিনে ফেলল,

- জাকির ! কেমন আছ বাবা?
- ভাল আছি,উমা বুবু। আপনি কেমন আছেন ?
- আমিও ভাল আছি, তোমার মুখ দেখে আমার মন জুড়ে যায়।
- উমা বুবু, আপনার কাছ থেকে কত যে উপকার পেয়েছি তা আপনাকে বুঝাতে পারব না। এই তিন বছর আমি আপনার কথা একদিনও ভুলতে পারিনি।
- জাকির, তোমার কাছ থেকে আমি আরও বেশী পেয়েছি। বড় হলে তুমি জানবে যে, লোকে যখন তোমার কাছে আর কিছু চায় না তখন তুমি তৃষ্ণায় মরে যাবে। আমার ছেলেমেয়ে নেই। তুমি যখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমার ভালবাসা নিয়ে যেতে তখন আমার আয়ু বেড়ে যেত... এক দিন বুঝবে।

আমি যে কয়দিন গ্রামে থেকে গেলাম, প্রত্যেক দিন কোন না কোন অজুহাতে উমা বুবুর কাছে এসে পাঁচ-দশ মিনিট বসতাম। এবারও কিন্তু যাওয়ার দিন তার কাছ থেকে বিদায় নিতে ভুলে গেলাম।

৪৫৯। উমা বুবু ১

আমার বয়স তখন পাঁচ বছর । মায়ের হাত ধরে বার বার রাস্তার মোড়ে গিয়ে উমা বুবুর কাছ থেকে বাদাম ভাজা কিনে নিতাম। তার আসল নাম আমি জানি না। সবাই তাকে উমা বুবু বলে ডাকত। আমিও তাকে উমা বুবু বলে ডাকতাম। তার ছোট চৌকিতে বসে উমা বুবু বাদাম ভাজা বেচত। তার বাদাম ভাজা কিন্তু অন্য রকম। সকালে ভাজত, তারপর গরম গরম বেচে দিত। বেচাকেনা শেষ হলে বাড়ি ফিরে যেত। মা তার কাছে বাদাম কিনত। কিনতে কিনতে অনেক পরামর্শ নিত। উমা বুবু যখন মাষ্টারী করত তখন অনেক বই পড়েছিল। তার অনেক জ্ঞান। সবাই তার কাছে পরামর্শ নিত।

যাবার আগে মা জিজ্ঞাসা করত, কত হলা? শুনে বাদাম ভাজার দাম দিত। আমি কিন্তু মনে করতাম, উমা বুবু তার পরামর্শের দাম নিচ্ছে। একদিন বাড়ি একা ছিলাম, মা গিয়েছিল নদীতে কাপড় কাচতে। আমার ছিল কাঠের তৈরী একটা ছোট্ট গাড়ী। সেদিন একটা তক্তা খুলে গিয়েছিল। তক্তা লাগাতে গিয়ে হাতুড়ির ঘা পড়ল আমার আঙ্গুলের উপর। ব্যথায় আমি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। তখন উমা বুর কথা মনে পড়ল। আমার একটা ছোট মানি-ব্যাগ ছিল। মামা, নানা, ফুফু আসলে সব সময় একটা করে সিকি দিয়ে যেত। আমি একটা সিকি নিয়ে উমা বুবুর কাছে গেলাম। তাকে আমার

সিকিটা দিয়ে বললাম, উমা বুবু, দেখ, আমার বুড়ো আঙ্গুলে হাতুড়ির ঘা লেগেছে। কি করব?

• ও, বেচারা! এখনই পুকুর ঘাটে যাও। পানিতে হাত ডুবিয়ে নাড়াতে থাক... আর হ্যাঁ, এই কয়টা বাদাম ভাজা আস্তে আস্তে খেতে থাক। দেখবে, ব্যথা কমে যাবে।

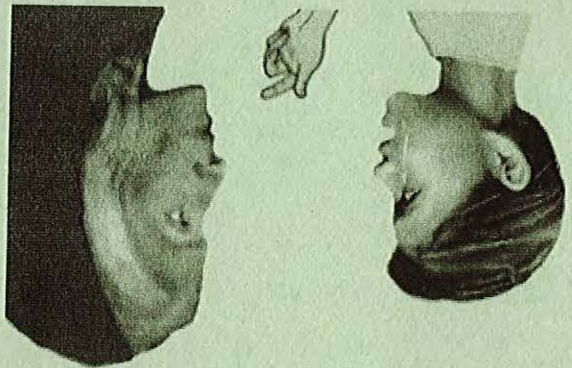

সেদিন থেকে দরকার হলে উমা বুবুর কাছে যেতে লাগলাম। একদিন একটা কাঠবিড়ালের বাচ্চা খেজুর গাছ থেকে পড়ে গেল। কি করে পালতে হয় আমি জানতাম না। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিকি নিয়ে উমা বুবুর কাছে দৌড়ে গেলাম।

• উমা বুবু, কেমন করে আমার কাঠবিড়াল পালতে হয়?

• প্রথমে দুধে অর্ধেক পানি মিশিয়ে পাতলা করে খাওয়াবে। রোজ ছয়-সাত বার খাওয়াতে হবে। একটু বড় হলে আমি বলব কি করতে হয়।

আমার কাঠবিড়াল বেঁচে গেল। এরপর যখন আমি উমা বুবুর কাছে যেতাম তখন কাঠবিড়াল আমার কাঁধে থাকত। উমা বুবু সব সময় তাকে কয়টা বাদাম ভাজা দিত, তাঁর জন্য পয়সা নিত না। আমার যাওয়া-আসা আরও ঘন হতে লাগল।

• উমা বুবু, স্যার বাংলাদেশের এই ম্যাপে সব নদীর নাম লিখতে বলেছে। এই নদীর নাম কি, বলতে পার?

• উমা বুবু, স্যার এই অংকগুলো কর্‌তে বলেছে, না পারলে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে। বাবা বাড়ি নেই, আর মা পারে না।

• উমা বুবু, অমল মার্বেল খেলায় তিন বার হেরে গেছে। আমি তার কাছে তিনটি মার্বেল পাব। ও দিতে চাচ্ছে না। তুমি কি বল?

আমার কাঠবিড়াল আমাকে সব সময় ভোরে জাগিয়ে দিত। একদিন কিন্তু সে আমাকে জাগাল না। আমি তাকে খুঁজতে লাগলাম, পেলাম না। মা হারানো জিনিস সব সময় খুঁজে পায়, সেও তাকে খুঁজে পেল না। আমি কেঁদে কেটে অস্থির। শেষে ভাবলাম, উমা বুবু অবশ্যই জানবে। আমি একটা সিকি নিয়ে তার কাছে গেলাম।

• উমা বুবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

• জানি খোকন। তোমার কাঠবিড়াল চলে গেছে।

• তুমি জানলে কি করে?

• সে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

• কি বলেছে? কবে ফিরে আসবে?

• আর আসবে না খোকন। যাবার সময় আমাকে বলে গেছে, আমি আর এক জগতে চলে যাচ্ছি। সেখানে কাঠবিড়ালের খেলা কোনদিন থামে না। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আর কেঁদো না খোকন। এই বলে উমা বুবু আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, তারপর আমার চোখ মুছে দিল, তারপর হাসল। উমা বুবু যখন হাসত তখন দুঃখ কোথায় চলে যেত! আমি বাদাম খেতে খেতে বাড়ি গেলাম।

দেখতে দেখতে ক্লাস ফাইভ শেষ হয়ে গেল। তখন একদিন গ্রাম ছেড়ে আমাকে শহরে যেতে হল। যাবার সময় আমি এত ব্যস্ত, এত উল্লাসিত যে, উমা বুবুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ভাবিনি। পরে কিন্তু কতবার তার কথা আমার মনে পড়ল! যখন হাতুড়ি পড়ত আমার বুড়ো আঙ্গুলের উপর, যখন বইতে একটা নদীর নাম খুঁজে পেতাম না, যখন আমার ময়না পাখিটা মারা গেল, যখন আমার সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হত আর বিচার করার লোক পেতাম না... তখন উমা বুবুর কথা আমার মনে পড়ত, আর মন যেন কেমন করত... একদিন ক্লাস এইট

৪৬০। উমা বুবু ২

তিন বছর পার হয়ে গেল। একদিন আমি গ্রামে ফিরে এলাম মা ও ভাইবোনদের নিয়ে মামা-নানাদের আমার মেট্রিক পাশের খবর জানাবার জন্য। দুপুরে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, সবাই আসল, সবাই রসগোল্লা খেল। কিন্তু আমার মন যেন কেমন করছিল। কে আসে নি?... তাই তো ! উমা বুবু তো আসে নি? আমি তাকে ডাকতে ভুলে গিয়েছিলাম ! তখন চারটা বাজে। উমা বুবু এখন বাড়ী থাকবে। আমি দুটি রসগোল্লা নিয়ে তার বাড়ীতে দৌড়ে গেলাম।

- উমা বুবু? উমা বুবু !
- কে ?
- আমি জাকির। উমা বুবু বাড়ী নেই ?
- জাকির! বস বাবা ! আপা বার বার তোমার কথা বলত।
- বলত... মানে ? উমা বুবু... কই ?
- উমা বুবু আর নেই বাবা ! এই তিন দিন হল মারা গেছে।
- উমা বুবু... মারা গেছে !...
- তোমার জন্য একটা চিঠি রেখে গেছে, এই দেখ, তোমার নাম লেখা আছে... । আর এই ছোট মানিব্যাগটাও রেখে গেছে।

আমি ছোট মানিব্যাগটা খুলে দেখলাম। মানিব্যাগটা সিকিতে ভরা। এই কয় বছর আমি তার পরামর্শ কেনার জন্য যত সিকি দিয়েছিলাম, উমা বুবু সেই সব সিকি রেখেছিল, একদিন আমাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য...

আমি চিঠিটা খুলে পড়লামঃ- জাকির বাবা আমার, যেখানে কাঠবিড়ালদের খেলা কোনদিন থামে না, আমি সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ইতি উমা বুবু। আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

উমা বুবু আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে ভুলেনি.........আর আমি তিন বছর আগেও তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে চলে গিয়েছিলাম!

কবরস্থানে গিয়ে আর কান্না থামাতে পারলাম না। কেঁদে কেঁদে বললাম • উমা বুবু, তিন বছর আগে যদি জানতাম ওটা ছিল তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, তা হলে আমি তোমাকে ছাড়তাম না... সারা দিন বসে বসে তোমার জ্ঞান মুখস্থ করতাম। সারা দিন তোমার মুখের হাসি দেখতাম, তোমার সঙ্গে সারা দিন বাদাম ভাজা খেতাম, উমা ববু আমার...

৪৬১। যুবক

নঈমুদ্দিনের ছেলে কলিমুদ্দিন। বাবা-মা বলে কলিম আমাদের হীরার টুকরা, যাই বলি তাই শুনে। দেখতে দেখতে কিন্তু কলিম ছাব্বিশ বছরে পা দিল, বাবা-মা টের পায়নি। একদিন বাবা কলিমকে বলল, কালু মিয়া ভোটে দাঁড়িয়েছে। তুই ওনার জন্য একটু কাজ করিস। পয়সা কড়ি দেবে। কলিম বলল, বাবা, কালু মিয়ার পয়সা আমি চাইনে। আমি ভজা চাচার দলে। বাবা অবাক। বলল, আগে আমার কাছে শুনলি না কেন? জানিস না তোর বাপ কালু মিয়ার লোক? কলিম বলল, জানি। আমি কিন্তু কালু মিয়ার লোক নই। নঈমুদ্দিন থ হয়ে গেল! বলল, আমার ছেলে অন্য দলে যাবে, আমার বংশে কোন কালে এমন ঘটনা ঘটেনি। ছেলে হাসলো, বলল, বাবা, এবার ঘটবে। যখন আমার চোখ ফোটেনি তখন তোমাদের মতে চলেছি। এখন আমার চোখ ফুটেছে। আমি কারো গোলামী করব না, নিজে নিজেই আমার পথ বেচে নেব।

• জানি, তোমার ভাইবোনদের জন্য পেট পুড়ে, তাই না?... শোন রুমা, তোমাকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে আরও তিন মাস লাগবে।

• সে তো অনেক দিন মেয়র সাহেব!

• আর একটু সহ্য কর মা। আমাদের কাজ শেষ না করে তোমাকে ছাড়ব না। এভাবে শিখবে, বাতি উল্টিয়ে দিলে তার ফল কি হয়।

• আমি উল্টিয়ে দিইনি মেয়র সাহেব, বিড়াল উল্টিয়ে দিয়েছিল!

• আচ্ছা রুমা, আমাকে একটু বল দেখি, যখন তোমার চুল ও কাপড় পুড়ছিল তখন তুমি কি করে পারলে তোমার চারজন ভাইবোনকে ঘর থেকে বের করতে?

• আমি যদি না করতাম ওরা সবাই মারা যেত মেয়র সাহেব। আপনি হলে কি করতেন?

• আমি কি করতাম জানি না মা। তবে কাজটা সহজ হল না, এটুকু জানি। আচ্ছা রুমা, তুমি বড় হলে কি করবে?

• আমি...পারলে... মাষ্টারী করতাম মেয়র সাহেব।

• দোয়া করি মা, বড় হও... মাষ্টারী করার জন্য আমরা তোমাকে সাহায্য করব...তবে তুমি এই বয়সে যা আমাদের শিখিয়েছ, তার চেয়ে মূল্যবান কিছু আমাদের শিখাতে পারবে না রুমা...

৪৬২। ছোট ভাইবোনদের জন্য

আমাদের এই দেশ থেকে অনেক দূরে, মহাসাগরের মাঝে, একটা দেশ আছে। তার নাম ফিলিপাইন। শত শত দ্বীপ। তার মধ্যে নেগ্রোস বলে বড় একটা দ্বীপ আছে। সেখানে পাহাড়-পর্বতের মাঝে একটা গ্রাম। সেখান থেকে পাহাড়ের দিকে যেতে আরও চার কিলোমিটার দূরে একটা ঘর। সেখানে বাস করে নয় বছরের একটি মেয়ে, তার বাবা-মা ও তার চারটি ভাইবোন। মেয়েটির নাম রুমা। রুমা সপ্তায় তিন দিন স্কুলে যায়। বাকী চার দিন সে বাবা-মায়ের সঙ্গে মাঠে কাজ করে। তার হাসি ও তার মিষ্টি স্বভাবের জন্য মাঠে এমন কেউ নেই যে তাকে না চেনে। বাড়ী ফিরলে ছোট ভাইবোনদের নিয়ে তার অনেক কাজ।
সেদিন বিকালে বাবা-মা দুজনে বাজারে গিয়েছিল। বাজার থেকে ফিরে আসতে অনেক রাত হবে।

রুমা তার ভাইবোনদের খেতে দিল ও শুইয়ে দিল। বাতির আলো কমিয়ে বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর নিজেও শুয়ে পড়ল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় বিড়াল টেবিলের উপর লাফ দিয়ে উঠল। বাতিটা উল্টে গেল, কেরোসিন পড়তে লাগল পাশের বিছানার উপর, রুমার চুলের উপর, তার জামার উপর। তারপর গায়ে আগুন লাগল। রুমা দৌড় দিল দরজার দিকে। দরজা খুলে ঝরণার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছনের দিকে চেয়ে দেখল, বিছানায় আগুন ধরেছে, তার উপরে ওর চারটি ভাইবোন শুয়ে আছে। রুমা ফিরে এল। চার বছরের ভাইকে ধরে ঘর থেকে বের করে দিল। রুমার চুল ও তার গায়ের জামা পুড়ছিল। রুমা আবার ফিরে এলো। এবার আরও দু'জনকে খুঁজে বের করল। আবার ফিরে গিয়ে তার সাত বছরের

বোনকে নিয়ে আসল, তারপর দৌড়াল ঝর্ণার দিকে...। রুমা পৌছাতে পারল না। যেতে যেতে অজ্ঞান হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না। বাবা-মা ফিরে এল এক ঘন্টা পর। তখন ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। চারজন ছেলেমেয়ে খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু রুমা? রুমা কোথায়? তারা ঝরণার দিকে গিয়ে তাকে খুঁজে পেল। রুমার পিঠ ও মাথার চুল

পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল। তার একটা কান আর নেই। বাবা বলল, রুমা মারা গেছে। সবাই অনেক্ষণ কাঁদতে লাগল। তারপর মা রুমার সমস্ত শরীর যত্নের সঙ্গে ধুইয়ে মুছে দিল। প্রান গেছে সত্যি, কিন্তু মুখের হাসি যায়নি। ভোর হয়ে গেল। মা মেয়েটার গায়ে হাত দিয়ে আশ্চর্য হল! রুমার শরীর এখনও ঠান্ডা হয়নি! তার বাবাকে বলল, রুমাকে আমার পিঠে তুলে দাও। আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব। বাবা মেয়েটাকে ধরে তার পিঠে চাপিয়ে দিল। মাথাটা ছিল তার কাঁধের উপর আর দু'হাত মায়ের বুকের সামনে ঝুলছিল। পাহাড়ী পথ ধরে মা হাসপাতালের দিকে নামতে লাগল। এক ঘন্টা পার হল। দু'ঘন্টা পার হল... এক সময় মেয়েটার দুটি হাত মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল!। মনের আনন্দে মায়ের নিশ্বাস থেমে গেল...

- মা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ?
- হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি মামণি, তুমি মরে গিয়েছিলে, আবার জ্যান্ত হয়ে গেলে।
- আমি আবার মরে যাব মা... দুঃখ করো না, আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

- তুমি মরবে না মামনি! আমরা তোমাকে সুস্থ করে তুলব।

আরও দু'ঘন্টা মা পাহাড়ী পথ দিয়ে নামতে লাগল। শেষে সদর হাসপাতালে পৌছে গেল। ডাক্তার ঘটনাটি শুনে বলল, ভয় করো না, সে বেঁচে যাবে। এমন মেয়েকে যদি বাঁচাতে না পারি আমরা ডাক্তার হয়েছি কি জন্য?...

- ডাক্তার সাহেব আমার পিছনে খরচ করবেন না। আমি মরে যাব । আমার ভয় নেই। আমার ভাইবোনদের বাঁচাতে হবে...

উত্তর দিতে গিয়ে ডাক্তারের গলা বুঁজে আসল । শেষে বলল, তোমাকে সুস্থ হতে হবে, আর কোন চিন্তা করতে হবে না। এসো, শুরু করি।

ডাক্তার কিন্তু শুরু করতে গিয়ে দখল, আগুন মেয়েটার কি সর্বনাস করেছে! তাকে বাঁচাতে হয়ত সে পারবে, কিন্তু তার মানুষের মত চেহারা ফিরিয়ে আনতে, দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া আর কেউ পারবেনা। তখন ডাক্তার একটা চিঠি লিখল। এক নাম-করা খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিল। লিখল, এমন মেয়েকে সুস্থ করতে না পারলে এই দেশের সম্মান থাকবেনা।

পরদিন রাজধানীর মেয়র খবরের কাগজটা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট বিমান ভাড়া করল। এক ঘন্টার মধ্যে সে নেগ্রোস দ্বীপে পৌছে গেল। সেখান থেকে রুমা ও তার মাকে নিয়ে ম্যানিলা শহরে ফিরে এল। সেখানে দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তাররা রুমার ঘা আস্তে আস্তে সারিয়ে তুলতে লাগল ও তার পুড়ে যাওয়া চামড়া এবং পেশী আবার গড়ে তুলতে লাগল। মেয়র সাহেব মাঝে মাঝে যায় রুমার সঙ্গে আলাপ করতে।

- কেমন আছ, রুমা?
- খুব ভাল আছি মেয়র সাহেব, কিন্তু....

শ্যামলীকে স্কুলের নীল পোষাক পরিয়ে বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার এখনও হাসিভরা মুখ দেখে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। চোখ থেকে পানি ঝরঝর করে পড়তে লাগল। শ্যামলীর মা আমার ঝুড়িটা দেখে বুঝতে পারল, আমি কে। ঘরে গিয়ে একটা কাগজ নিয়ে আসলঃ-

বুবু, শ্যামলী বলেছে এই ছবি খালাম্মাকে দিও।

শ্যামলী একটা পাখি এঁকেছিল। নীচে লেখা ছিল, একটা শালিক তোমার আনন্দের জন্য। আমি তার মাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদতে লাগলাম। তারপর বসলাম শ্যামলীর হাসিমুখের সামনে আমার মনের কথা বলার জন্যঃ- শ্যামলী, সেদিন যদি জানতাম তোমার সঙ্গে ওটা ছিল আমার শেষ কথা, তাহলে সারাদিন তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমি যদি জানতাম শেষবারের মত তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ, তবে আমার মনের কান্না লুকিয়ে রাখতাম। তোমাকে সুখী করার জন্য শুধু হাসতাম। আমি যদি জানতাম, এই তিন দিন ছিল তোমার জীবনের শেষ দিনগুলি, তবে আমি বাঁচি-মরি তোমার নৌকা কিনে দিতাম ও তোমার সঙ্গে গাঙ শালিকদের বাসায় গিয়ে তিন দিন ধরে তোমার সঙ্গে থাকতাম...। আমি যদি জানতাম জীবনে এই শেষবার তুমি আমার কোলে উঠলে, তিনদিন আমি তোমাকে ধরে রাখতাম, নামতে দিতাম না, এক হাজার বার তোমার কানে কানে বলতাম, তোমাকে কত ভালবাসতাম, হাসিমুখী মা আমার!

৪৬৩। মধুমতী নদীর ঘাটে

মধুমতী নদী এঁকে বেঁকে বয়ে যায়। সুতরাং তার গতি যখন বাড়ে তখন পাড় ভেঙে পড়ে। তখন নদীর পাড় সেই জায়গায় এত খাড়া হয়ে যায় যে কেউ সেখানে উঠা-নামা করতে পারে না, বিড়াল পর্যন্ত উঠতে পারে না তাই সেখানে গাঙ শালিকেরা গর্ত করে বাসা বাঁধে। কোন কোন জায়গায় তারা শত শত বাসা বাঁধে। সকালে ও বিকালে কিচির-মিচির করে, দলে দলে উড়ে উড়ে আকাশে নকসা কাটে, দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। এমন জায়গার পাশে আমাদের হাটখোলা। হাটখোলার কিছু দূরে খেয়াঘাঠ। নদী পার হলে আমাদের ছোট গ্রাম। আমি সপ্তায় দু'দিন নদী পার হয়ে হাটে আসি।

আমার স্বামী টাউনে কলেজে প্রফেসারী করত। আমাদের বিয়ে হয়েছিল বারো বছর আগে, আমার আই.এ.পাশ করার পর-পরই। আমরা সুখে ছিলাম। একদিন আমার স্বামী ঢাকা থেকে ফিরে আসছিল, হঠাৎ বাস উল্টে গিয়ে সে মারা গেল। আমি দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে টাউন ছেড়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলাম। বেঁচে থাকার জন্য হাঁস-মুরগী পালি, সপ্তায় দু'বার হাটে গিয়ে ডিম বেচি ও সওদা করে আসি।

তিন মাস আগে একদিন খেয়ায় উঠে দেখি, একটা ছোট মেয়ে বসে আছে। তার বয়স আট বছর হতে পারে। তার গায়ে স্কুলের নীল পোষাক, তবে হাতে বই-খাতা কিছু নেই। তার সঙ্গে কেউ নেই।

- তোমার নাম কি মা?
- আমার নাম শ্যামলী।
- তোমাকে কোন দিন দেখিনি তো মা, তোমার বাড়ী কোথায় ?
- আমার বাড়ী যশোর। নদীর ওপারে আমার মামার বাড়ী।
- তুমি তো খুব সুন্দর করে হাস।

• তুমিও খুব সুন্দর করে হাস, খালাম্মা।

• তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। অনেক দিন ধরে এই কথা কেউ আমাকে বলেনি।

• কেন! তোমার আয়না নেই ? আয়না দেখলে বুঝতে পারবে।

• আর আমার আয়নার দরকার হবে না মা, তুমি যখন বলছ তখন কথাটি অবশ্যই সত্য। এখন যাবে কোথায় ?

• কোথাও যাব না। আমি যাই আর আসি, আবার যাই,আবার আসি...। মাঝি আমার দাদু হয়, পয়সা নেয় না।

• যাওয়া-আসা কর কেন ?

• আমি মানুষের মুখ দেখি। যদি তারা মুখ গোমড়া করে থাকে তাহলে আমি হাসি। তখন তারাও হাসে।

• সেজন্য কি তুমি হাসছিলে আমার মুখ দেখে?

• না খালাম্মা,আমি হাসছিলাম তোমার ঝুড়িটা দেখে।

• কেন, হাসবার কি আছে?

• আমি ভাবছিলাম, একদিন আমিও ডিম বেচতে যাব... ডিম বেচে একটা নৌকা কিনব, তারপর নৌকা বেয়ে গাঙ শালিকদের বাসা দেখতে যাব। সারা দিন ওখানে থাকব। তারা কিচির-মিচির করে আকাশে নকশা কাটে। আমি সারা দিন তাদের খেলা দেখব ও তাদের গান শুনব।

পরের হাটবার যখন নৌকায় উঠলাম তখন খুঁজলাম তার চিকন মুখের হাসি। তারপর তাকে দেখতে দেখতে আমার অভ্যাস হয়ে গেল ও তাকে না দেখলে আমার মন কাঁদে। আমি খড় ও খেজুরের পাতা দিয়ে

নানারকম জিনিষ তৈরী করতে শিখেছিলাম। এক দিন শ্যামলীর জন্য একটা ছোট হাড়ি তৈরী করলাম। সঙ্গে আবার একটা কড়াই ও চারটি প্লেট। শ্যামলী খুব খুশি হল। পরের বার সে আমাকে এনে দিল নিজের হাতে আঁকা একটি ছবি। বলল, খালাম্মা নাও, তোমার জন্য এঁকেছি। এটা হল আমার নৌকা। এই দেখ,আমি নৌকা বাই, মাঝখানে তুমি বসে আছ, আর এটা হল তোমার ডিমের ঝুড়ি। আমরা ডিম বেচতে যাচ্ছি, তারপর যাব গাঙ শালিকদের বাসা দেখতে। সেখানে সারা দিন থাকব... শুধু গান শুনব আর খেলা দেখব... কোন কাজ করতে হবে না... রান্নাও করতে হবে না... জান খালাম্মা ? তুমি আমাকে যে হাঁড়ি, কড়াই, প্লেট দিয়েছিলে, মা তা খুব পছন্দ করেছে। কিন্তু আমি যখন তাই দিয়ে খেলতে গেলাম তখন বলল, থাক শ্যামলী, তোমার রান্না শেখা লাগবে না মা। যতদিন বেঁচে থাক তোমার জন্য আমি রান্না করব মা... সেদিন শ্যামলীর কথা আমি বুঝতে পারিনি।

আরও দু'সপ্তা গেল। একদিন নৌকায় উঠে দেখি,শ্যামলী নেই।

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদু, শ্যামলী কই ?

দাদু হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলঃ- শ্যামলী আর নেই মা... আজ দুপুরে মারা গেছে।

• মানে... শ্যামলী... মারা গেছে !

• সে তিন মাস আগে ওর মামার বাড়ী এসেছিল, কারণ তার রক্তে ক্যান্সার হয়েছিল। ডাক্তারের মতে অনেক আগে তার মরার কথা। তিন মাস বেশী বেঁচে গেছে তার হাসির গুণে।

• ওদের বাড়ী কত দূর?

• চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

• মা, ডাক্তার বলেছে ছয় মাস আমি কাজ করতে পারব না... আমাদের কি হবে?... আমার কিন্তু দোষ নেই মা, আমি খুব সাবধানে চলছিলাম, কিন্তু মানিক সাবধান হয়নি।

• মানিক!... মানিক কে?

• মানিক আমার ছেলে বুবু। তোমার মেয়ে যদি না দৌড়াত, আমার ছেলে গাড়ী চাপা পড়ে মারা যেত। কার কাছে এই বয়সে সে পরের ছেলের জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিতে শিখেছে?

• ...জানি না বোন... তবে হ্যাঁ... ওর বাবা রিক্সা চালাত। একদিন এক মহিলা ও তার ছেলে তার রিকশায় উঠেছিল। হঠাৎ রিক্সার চাকা পথে আটকে গেল। দ্রুতবেগে একটা ট্রাক আসছিল। ওর বাবা সঙ্গে সঙ্গে নেমে চাকাটা ধরল। রিকশাটা ফুটপাতে উল্টিয়ে তাদের বাঁচাল... কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না...। মেয়েটাকে সে কিছু দিয়ে যেতে পারেনি, তবে হয়ত ওর বাবার স্বভাব তার রক্তে লেগেই আছে।

পরের দিন শেলী যখন দাদুর কাছে তার ব্যাগ নিয়ে গেল তখন দাদু রেডিও শুনছিল। রেডিওতে চট্টগ্রামের মেয়র সাহেব কথা বলছিলঃ- ভাই সব, দুই বছর আগে দুজন অপরিচিত লোক বাঁচাতে গিয়ে মেংহর বাবা প্রাণ হারিয়েছিল। তার নাম আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার আট বছরের মেয়ে মেংহ যখন পরের একটা শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে বিপদে ঝাপিয়ে পড়ে, তখন আমাদের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। যে জাতি এই মেয়ের জন্ম দিয়েছে সেই জাতি গর্ব করতে পারে। আমি শপত করছি আমাদের এই মেয়েকে আমি জীবন ভরে নিজের মেয়ের মত আপদে বিপদে রক্ষা করব, আল্লার কসুম!

৪৬৪। মেংহ

মেংহ আট বছরের মেয়ে। সে চট্টগ্রামে বাস করে। তার বাবা-মা বান্দরবান থেকে এসেছিল। বাবা রিক্সা চালাত। একদিন বাবা গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেল।

এখন মেংহ একা একা ঘরে থাকে। মা পরের বাড়ীতে কাজ করে, বিকাল বেলা বাসি ভাত-তরকারী নিয়ে বাড়ীতে আসে। দু'জনে ভাগ করে খায়। খাবার পরেও তাদের খিদে লাগে, তারা ভাবে, কখন আবার খেতে পাব।

মেংহ প্রতিদিন দেখতে পেত, একটা ছোট মেয়ের হাতে প্লাষ্টিকের একটা থলি আর একটা লাঠি। একদিন জিজ্ঞাসা করল, আমার সঙ্গে খেলবে?

• এখন পারব না, আমার কাজ আছে। তোমার নাম কি ?

• মেংহ । ঐ লাঠি দিয়ে আর ঐ থলি দিয়ে কি কর?

• কাজ করি। এসো, দেখে যাও।

মেংহ তার পিছু পিছু গেল। শেলীর দু'চোখ চিলের চোখের মত। রাস্তা-ঘাট যেন সে চোখ দিয়ে ঝাড় দেয়। কোন জিনিস তার নজর এড়ায় না। যদি তার কোন মূল্য থাকে সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে থলিতে ভরে। মেংহ বারবার জিজ্ঞাসা করে, ওসব আজে বাজে জিনিস নিয়ে করবে কি?

• আমার সঙ্গে চল মেঙ্গও, বুঝতে পারবে ।

• হিঃ হিঃ, মেঙ্গও না, আমার নাম মেংহ। থলির একটা আংটা আমাকে দাও, তুমি আর পারছ না। আধ ঘন্টার মধ্যে থলি খুব ভারি হয়ে গেল। তারা এক দোকানের সামনে থামল। দোকানদারের দাড়ি ধব ধবে সাদা

তার বয়স আশি বছরের কম নয় । সে শেলীর দিকে চেয়ে হাসল।

• শেলী, কেমন আছ ?

• ভাল আছি দাদু তুমি কেমন ?

• আল্লা রেখেছে আর কি.... আজ তোমার অনেক মাল দেখছি... প্লাস্টিকের জিনিস আলাদা করে দাও, আমি মাপতে থাকি।

দোকানদার প্লাস্টিকের সব জিনিস দাড়িপাল্লায় তুলে মাপতে লাগল, তারপর বাকী সব, কৌটা, স্পঞ্জ, জুতা, লোহার টুকরো নিয়ে একটা আলাদা গাদা করে নিজের খাতা বের করে হিসাব করতে বসল।

• শেলী, আজ তোমার হয়েছে সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা। টাকা নেবে, না খাতায় লিখে রাখব?

• পাঁচ টাকা লিখে রাখ। বাকী আড়াই টাকা মেঙ্গওরে দাও। সে আমাকে সাহায্য করেছে। আর, ভাল কথা, মেঙ্গওরে একটা ভাল থলি দিয়ে দাও, কাল থেকে সেও মাল আনবে। আমি তাকে বলে দেব কোথা থেকে মাল কুড়িয়ে আনতে হবে।

পরের দিন থেকে মেংহ টোকাইয়ের কাজ করতে লাগল। তার চোখ শেলীর চোখের মত তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। রাস্তাঘাট দ্রুত দেখে ফেলে। কোন জিনিষ তার নজর এড়ায় না। যদি তার কোন মূল্য থাকে সঙ্গে সঙ্গে তার থলিতে কুড়িয়ে নেয়। তার থলি মোটা হয়ে গেলে দাদুর কাছে যায়। রাত্রে মা কাজ থেকে ফিরে আসলে মেংহ গামছা খুলে দেখায়। প্রতিদিন আধা কেজি চাউল নিয়ে আসে। মা হাসে ও তাকে আদর করে। তারপর রান্না চাপায়। এখন রাত্রে তারা দু'জন পেট ভরে খায়। তারপর মা তাকে কোলের কাছে নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করে।

মামা বাড়ীর কথা বলে, পাহাড়ের কথা বলে, বন-জঙ্গলের কথা বলে। সেখানে ছেলেরা ধনুক নিয়ে শিকারে যায়। সেখানে মেংহর বাবার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মেংহর বাবা ছিল খুব ভাল। মেংহকে সে খুব ভালবাসত। সেজন্য টাউনে এসেছিল। টাকা আয় করবে, তারপর মেংহরে এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবে, তাকে আর কষ্ট করতে দেবে না... বলতে বলতে মায়ের গলা ধরে আসত, মেংহকে আঁকড়ে ধরত, বলত, তুমি আমার একমাত্র মানিক... রাস্তায় খুব সাবধানে চল... তোমার যদি কিছু হয় আমি মরে যাব...।

মেংহ রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে খুব সাবধানে চলত। পার হবার আগে দু'তিন বার এদিকে ওদিকে লক্ষ্য করত। বাবা গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেছে, তার খুব ভয়।

সেদিনও মেঙ্গও কাজে গিয়ে খুব সাবধানে চলছিল। তার সামনে দিয়ে পাঁচ-ছয় বছরের এক ছেলে মায়ের হাত ধরে হাঁটছিল। মা তার জন্য একটা বল কিনেছে, তার চোখে মুখে আনন্দ ধরে না। বলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল আর বকবক করে যাচ্ছিল। হঠাৎ বলটা তার হাত থেকে ফসকে রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। ছেলেটা কোন দিকে চেয়ে দেখল না। হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে বলের পিছনে দৌড় দিল। মেংহ চিৎকার করে উঠল। দ্রুত বেগে একটা গাড়ি আসছিল। মেংহ চিন্তা করার সময় পেল না। দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে ঠেলে রাস্তার পাশে ফেলে দিল। ছেলেটার কোন ক্ষতি হল না। কিন্তু মেংহর এক পা গাড়ী চাপা পড়ল এবং ভেঙ্গে গেল একটা পাটকাঠির মত।

শেলী যখন মেংহর মায়ের কাছে গিয়ে খবর দিল তখন মায়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। হাসপাতালে এসে দেখল, মেংহর পায়ে প্লাস্টার লাগান হয়ে গেছে। মেংহ খুব জোরে মাকে জড়িয়ে ধরল।

৪৬৬। হাতের কাজ

রাবেয়া ক্লাসের সবচেয়ে খারাপ ছাত্রী। উপরন্ত তার মুখ দেখলে কেউ তাকে এক পয়সা দাম দেবে না। গায়ের রং কালো তো বটে, আর মুখে কোন সোভা নেই। সেদিন আপার জন্মদিন উপলক্ষে সব ছাত্ররা কোন না কোন উপহার এনেছিল। রাবেয়ার টাকা নেই, কিছু কিনতে পারেনি। সে খেজুর গাছের পাতা ও খড় দিয়ে একটা পাখির বাসা তৈরী করেছে। সকলের শেষে যখন আপার টেবিলে তার উপহার নিয়ে আসল, তখন সব ছেলেমেয়ে হাসল। আপা কিন্তু বলল, তোমরা আমার জন্য টাকা খরচ করেছ, তাই বুঝলাম তোমরা আমাকে ভালবাস। কিন্তু এই পাখির বাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। উপরন্তু তৈরী করতে সারা দিন সময় লাগে। শুধু কি তাই? এই দেখ, রাবেয়া ছাড়া এত নিপুন কাজ কেউ করতে পারে না। রাবেয়া, তুমি যে এত সুন্দুর কাজ করতে পার আমি তা জানতাম না। রাবেয়া এবার হাসল। রাবেয়া যখন হাসত তখন কেউ তাকে বিশ্রী বলতে পারত না। সেদিন থেকে রাবেয়ার দাম চার গুন বেড়ে গেল, তার মুখে হাসি বাসা বাঁধল, আর কেউ তাকে ঠাট্টা করল না। তখন লেখাপড়ায়ও দ্রুত উন্নতি করতে লাগল। ক্লাস ফাইভের শেষে তার রোল নম্বর ছিল প্রায় সবার আগে। তারপরে আপার সঙ্গে তার দেখা হল আট বছর পর। তখন এক ভদ্র লোক স্কুল দেখতে এল। সে ছিল পাশের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার স্ত্রীও সঙ্গে এসেছিল। তার হাসি দেখে আপা তাকে চিনে ফেলল। জিজ্ঞাসা করল, রাবেয়া, এখনও কি পাখির বাসা তৈরী কর? রাবেয়া উত্তর দিল, শুধু তা নয় আপা, আমি একটা নতুন স্কুল খুলেছি। সেখানে আমার মত কালো মেয়েরা শেখে সব রকমের হাতের কাজ, আর আমার মত হাসতেও শেখে, এমন কি, হাসতে হাসতে সুন্দরী হয়। পাশাপাশি যত রাজপুত্র বাস করে, তারা যখন ঘোড়ায় চড়ে একটা সুন্দরী বউ খুঁজতে যায়, তারা আগে আমার স্কুল দেখতে আসে।

৪৬৫। মেথর

সেদিন জলিলের মেজাজ খুব খারাপ ছিল। সকালে স্যার তাকে বাচাল বলে তিরস্কার করেছিল, আবার তিরস্কার করেছিল তার বাড়ীর কাজ দেখে। তারপর মাসিক পরীক্ষায় পাঁচ নম্বর পেয়েছে। লজ্জায় মুখ লুকাবার জায়গা পাচ্ছে না।

জলিল চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলে । ছেলেটা খারাপ নয়।

এবার কিন্তু যখন শিবু তার সঙ্গে মারবেল খেলায় তিন বার জিতে গেল, তখন আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সারাদিনের রাগ তার উপর ঝেড়ে দিল। খেলার শেষে শিবু বলল,

- জলিল, আমি তোমার কাছে পাঁচটি মারবেল পাব, দাও।
- দেব না, ফাঁকিবাজ, মেথর কোথাকার !
- কি বললে তুমি...?

- কি আর বললাম! যা সত্য তাই বললাম। তুই ফাকি দিস্ আর তুই মেথরের ছেলে।

দুঃখে-রাগে শিবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কোন উত্তর দিল না। তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

পরের দিন স্কুলে এল না । তার বাবা এসে স্যারকে বলল, স্যার, আমার ছেলে আর স্কুলে আসবে না। অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেব।

- কি হয়েছে, বলবেন তো?
- আমরা গরীব মানুষ হতে পারি, কিন্তু আমাদেরও সম্মান আছে ।

স্যার ছাত্রদের কাছে ঘটনাটা শুনল। তারপরে চেয়ারম্যানের কাছে একটা চিঠি দিল। "মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, দয়া করে একবার

স্কুলে আসুন। ব্যাপারটা খুব জরুরী। ইতি। হেডমাষ্টার, শরিফুল আলম"। চিঠিটা এক ছাত্রের হাতে পাঠিয়ে দিল। চেয়ারম্যান সাহেব স্কুলে আসার পথে ছেলেটার মুখে ঘটনাটি শুনল। স্কুলে আসার সাথে সাথে প্রথমে সে শিবুর বাবার হাত ধরে বলল,

• আনন্দ বাবু, আমার ছেলে অন্যায় করেছে, তাকে মাফ করে দিন। নিশ্চিন্ত থাকুন এমন ঘটনা আর কোন দিন ঘটবে না।

তারপর চেয়ারম্যান সাহেব সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় বসতে বলল। ক্লাস এত চুপ হয়ে গেল যে, একটা চাল পড়ে গেলে তার শব্দ শোনা যেত। চেয়ারম্যান বলল,

• জলিল, কোন কাজ তোমার সবচেয়ে নিচু মনে হয়?
• মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারের কাজ।
• বেশ, কাজটা যদি নিচু কাজ হয়, তাহলে তা করতে নেই, কেমন?
• তাই তো।
• ঠিকই তো?
• ঠিক।
• বেশ, আমাদের পায়খানার গর্ত ভরে গেছে। আমি ভাবছিলাম ওটা খালি করার জন্য আনন্দ বাবুকে ডাকব। কিন্ত তোমার মতে ওর পেশাটা ভাল নয়, ঠিকই তো?
• ঠিক।
• তার মানে, নিজের পায়খানার গর্ত নিজে খালি করা উচিত, তাই না?
• মানে...

• জানি, এই কাজ করার জন্য সাহস লাগে। দুই তিন ঘন্টা ধরে ঐ দুর্গন্ধ সহ্য করা সহজ নয়। সেই সাহস তোমার নেই, কি বল?
• মানে... আমি...
• এছাড়া আর কি উপায় আছে বল?
• তাই তো ....
• তা হলে এবার তাই করব। আজ স্কুলের পর আমরা দু'জন আমাদের পায়খানার গর্ত খালি করে ফেলব। ছ'মাস পরে গর্তটা আবার ভরে যাবে। তখন যদি তোমার মত্ পাল্টে যায়, তাহলে শিবুর বাবাকে খবর দেব, কি বল? সে আমাদের কাজ করে দেবে। আমি তাকে চিনি, তার সাহসের অভাব নেই। সেইজন্য তোমার জন্মের আগে থেকে আমি তার বন্ধু, এই কথা সবাই জানে।

সেদিন স্কুলের পর জলিল তার বাবার সঙ্গে পায়খানার গর্ত খালি করে দিল। তার দুই তিন বার বমি হল, কিন্তু কাজ শেষ না করা পর্যন্ত বাবা তাকে ছাড়ল না। সেদিন জলিল বুঝল কাজটা কত দরকারী ও করতে কত কষ্ট হয়। সেদিন থেকে আর কোনদিন শিবুকে অপমান করল না। আরও বুঝল যে, কোন নিচু পেশা জগতে নেই, নিচু পেশা হল শুধু অলস হয়ে বসে থাকা।

৪৬৭। তমাল

তমাল ১৪ বছর বয়সে ক্লাস ফোরে পড়ে। ছোটবেলায় তার স্বাস্থ্য এত দুর্বল ছিল, এত ঘন তার অসুখ হত যে, মা তাকে স্কুলে পাঠাবার কথা ভাবতেই পারেনি। আট বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হল। আবার তার অসুখ হল। সুস্থ হলে আবার ভর্তি হল। শেষে তার স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল। তখন তমাল দ্রুত বাড়তে লাগল কলাগাছের মত। চৌদ্দ বছর বয়সে সে এত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে যে, বাবা তার জামা-কাপড় কেনার টাকা যোগাড় করতে পারে না। তাকে দেখলে সব সময় মনে হয় যেন তার ছোট ভাইয়ের কাপড় পরে বেড়ায়।

তমাল জানে অসুখ ও দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে। সুতরাং দুর্বলদের প্রতি দুর্ব্যবহার সহ্য করতে পারে না। সেদিন মর্তুজা খেলার সময় বারবার একটা পাটকাঠি দিয়ে দাউদের পিঠে ঘা মেরে পালাচ্ছিল। দাউদ আবার কুঁজো। তমাল একবার ভ্রূ কুঁচকে বলল, থাম তো ! মর্তুজা যখন শুনল না, তখন তমাল দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরে ফেলল, তারপর পাছায় এময় চারটে ঘা দিল যে, মাঠের সব ছেলেমেয়েরা শব্দটা শুনতে পেল। সেদিন থেকে আর কেউ দাউদের গায়ে হাত দিল না।

আর একদিন শিক্ষকের অসুখ হল। তার পরিবর্তে স্কুলে এলো একটি মহিলা, রোগা, ভীতু, অল্প বয়সী। জীবনে এই প্রথম সে একটা ক্লাস পড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মর্তুজা বাজে ব্যবহার করতে লাগল। তার দেখাদেখি আরও অনেকে খেলা করতে ও জোরে কথা বলতে শুরু করল। মহিলাটি ভয় পেল। তার মুখ

ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে, এমন ভাব। তখন

হঠাৎ তমাল উঠে দাঁড়াল। সবাই তার দিকে তাকাল। বলল, আমার কথা শোন! আর একবার যদি কেউ ফাজলামি করে আমি তার মুখে একটা ঘুসি মেরে চারটি দাঁত ফেলে দেব, আমার নাম তমাল! এই বলে, যারা সবচেয়ে বেশী উৎপাত করছিল তাদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকাল। তারপর বসল। তখন থেকে মহিলাটির ক্লাস নিতে আর কোন কষ্ট হল না।

তবে হ্যাঁ, তমালের একটা দোষ ছিল। সে ক্ষুধা সামলাতে পারত না। সুতরাং প্রতিদিন বাড়ী থেকে মুড়ি এনে যখন তখন খেত। দাউদ ক্লাসের সময় তার পাশে বসত। একদিন তমাল দেখল, ছেলেটার মুখ সাদা হয়ে গেছে, মাথাটা বেঞ্চের উপর পড়ে যাচ্ছে।

- দাউদ, কি হয়েছে তোমার ?... তোমার অসুখ নাকি ?
- সকালে কিছু খাইনি। বাড়ী কিছু ছিল না।
- এই নাও।
- না, না, আমি তোমার মুড়ি খাব কেন ?
- নাও বলছি। আমি কত খেয়েছি! আমার আর খিদে নেই।

সেদিন থেকে, যখন দাউদের মুখ সাদা দেখত, তখন তমালের আর ক্ষুধা লাগত না। মুড়িটা দাউদের পেটে চলে যেত। সারা বছর এভাবে চলল। এমন মাস গেল যখন দাউদ প্রতিদিন না খেয়ে স্কুলে আসত। তখন তমালের মুড়ির অর্ধেকের বেশী দাউদ খেয়ে ফেলত।

বছরের শেষে স্যার তার অভ্যাস মত

৪৬৮। আদালত

গফুর রহমত মিয়ার কাছে জমি বন্ধক রেখেছিল। এ বৎসর জমি খালাস করতে গেলো। রহমত মিয়া জমি ছাড়তে চায় না। গফুর শালিস ডাকলো। রহমত মিয়া হাড়ে হাড়ে শয়তান। শালিসের সময় ঝগড়া বাঁধালো। সবাই উঠে গেলো।

গফুর উকিলের কাছে গেল। ৫০০ টাকা দিল। উকিল বলল, মামলা কর, জমি পেয়ে যাবে। গফুর মামলা করল। রহমত মিয়া মামলার দিন পিছিয়ে দিতে লাগল। গফুর আদালতে যায়। যাওয়া আসার খরচ ২০০ টাকা। উকিল বলে, কাগজপত্র বার করতে হবে। টাকার দরকার। গফুর ফতুর হয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

দুই বছর পার হয়ে গেল। মামলা চালিয়ে গফুর ফতুর হয়ে গেছে, জমি ফিরে পায়নি। ভুলু সমবায় সমিতির লোক ডাকল। সবাই মিলে আলোচনা করল। পরদিন মোড়লের বাড়ীতে বৈঠক বসল। বিচারে সবাই রায় দিল, গফুরের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। রহমত মিয়া বিচার মানল না। বলল আদালত যে রায় দেবে তাই মেনে নেব। তোমাদের বিচার মানি না।

এবার কিন্তু রহমত মিয়া বিপদে পড়ল। কেউ তার জমিতে কাজ করে না। তার হাঁস-মুরগী হারিয়ে যায়। গরু-ছাগল হারিয়ে যায়। রহমত মিয়ার অনেক দেনা হয়ে গেল। এক বছরে দুই বিঘা জমি বিক্রি করতে হল। শেষকালে রহমত মিয়া গফুরকে ডাকল। বলল, তোমার জমি নিয়ে আমার লোকসান হচ্ছে। এই নাও তোমার দলিল।

একটা সুন্দর বই কিনল,
তারপর সব ছাত্রদের হাতে একটা করে কাগজ দিল।

• তোমাদের সাথীদের মধ্যে পাঁচজনের নাম লেখ, যাদের কাছ থেকে তোমরা উপকার পেয়েছ। কি উপকার পেয়েছে তাও লেখ। কাগজে কিন্তু তোমাদের নাম লিখবে না।

পনের মিনিট পরে যখন স্যার সবার সামনে কাগজগুলো পড়ল,
তখন তমালের মুখ লাল হয়ে গেল। তার নাম ছিল প্রত্যেকটি কাগজে। একজনকে দিয়েছিল মুড়ি, আর একজনকে তিনটি বাতাসা বা একটা খাতা, একটা কলম, একটা কান্টা, তিনটি আম, বাড়ীতে কাঁঠাল খেতে নিয়ে গেছে, একজনকে মস্তানদের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তিনজনকে ফুটবল খেলা শিখিয়েছে। শুধু একটা কাগজে তার নাম ছিল না। সবাই বুঝল, কে তমালের নাম লেখেনি। এদিকে কিন্তু সবাই বুঝল তমালের কাগজ কোনটা, কারণ সে লিখেছিল:

ঃ দাউদ আমাকে খুব উপকার করেছে, সে সব সময় আমার পক্ষে থাকে। সবাই জানে দাউদ সব সময় কার পক্ষে থাকে : খেলার সময় তমাল যদি হেরে যায় তা হলে দাউদ কেঁদে ফেলে আর সবাই তাকে ঠাট্টা করে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, দাউদের পরে তমাল লিখেছিল মর্তুজার নাম। মর্তুজা নাকি তাকে আম গাছে উঠতে সাহায্য করেছে। এই কথা সত্য কি না তা কেউ যাচাই করতে গেল না, কিন্তু সবাই বুঝল তমাল কেন মর্তুজার নাম লিখেছে। মর্তুজার নাম আর কোন কাগজে লেখা হবে না। সে খুব দুঃখ পাবে যদি কেউ তার নাম না লেখে, সেইজন্য তমাল এই মিথ্যাকথা লিখেছে।

শেষে স্যার গুনে গুনে বলল, তমালের নাম তোমরা পয়ত্রিশ বার লিখেছ। এই নাও তমাল, এইটা হল জগতের সেরা গল্পের বই। সকলেই হাত তালি দিল, সকলেই খুশি হল, কেউ দুঃখ করল না।

বে যেত । বাকি কাজ করা সহজ। এক মিনিটের মধ্যে পানির উপরে
াকাও নেই, মানুষেরও চিহ্ন নেই।
ত্যেকটি ঘটনা তাদের মনে পড়ে গেল। ঐসব মানুষের লাশের দুর্গন্ধ
াদের নাকে এখনও লেগে আছে। মুখে মুখে তারা শুধু গ্রাম ও দেশ
ক্ষা করেছে বলে গর্ব করে। তাদের মুখে হাসি। তাদের কৃতিত্বের
ন্য দেশ তাদের স্বর্ণপদক প্রদান করেছে। কোন জাতীয় অনুষ্ঠান হলে
রা সেই স্বর্ণপদক পরে গর্ব করে বেড়ায়। অবশ্য আক্তার সাহেব
র্ণপদক ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছে , কোনদিন পরেনি। যুদ্ধের কথা
কানদিন উল্লেখ করেনা, গর্ব করা তো দূরের কথা। আজও তার
ারনে সকলের আনন্দের উপর নিরানন্দের ছায়া পড়ে যায়।
রে যাবার সময় আক্তার সাহেব সকলের শেষে রিক্সায় উঠল। সন্ধ্যা
তে আর দেরী নাই। হঠাৎ মাঝপথে আধাবয়সী একটা লোক তার
কে চেয়ে হাত তুলল ।
ভাই, একটু থামবেন?
কি ব্যাপার?
আমার বাড়ি এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। মাছ ধরতে এসে
কটা সিং পায়ে কাটা মেরেছে। হাটতে পারছি না। আর এই জায়গায়
কান রিক্সা পাওয়া যাবেনা।
বেশ, উঠে আসুন। রিক্সাওয়ালার একটু কষ্ট হবে আর কি।
ক্সাওয়ালা লোকটির বাড়ীতে পৌঁছল। গোলপাতার ঘর, তবে
রিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রিক্সাটা দেখে তার মেয়ে ঘর থেকে বের হল।
নের বছরের মেয়ে।
আববা, কি হয়েছ! রিক্সায় কেন!
কিছু হয়নি মা। একটা সিং আমার পায়ে কাটা মেরেছে। তোমার
চা আমাকে রিক্সায় উঠিয়ে নিয়ে এসেছে।

৪৬৯। মানিক মিয়া ১

ঢাকার মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। প্রফেসর আখতারুল হক এ মাসে এত বেশী কাজ করেছে যে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। আজ সে এত ক্লান্ত যে, অফিস থেকে বের হবার শক্তি পাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছে। হঠাৎ পরিচিত একটা কণ্ঠ তার কানে ভেসে এল।

• আক্তার ভাই কই ? একদিনের জন্য ওকে এই গর্ত থেকে বের করতে হবেই। বেটা এক দিন কাজের চাপে মরে যাবে, আর সবাই দোষ দেবে আমাদেরই... এই যে, আক্তার ভাই, চোখ খোল দেখি... আর একশ টাকা বের কর তো... ?

• ইন্দ্র ! কেমন আছ ভাই ? লূৎফুর! সেলিম! কেমন আছ সবাই?

• কাল সকাল সাতটায় তৈরী থাক, আমরা তোমাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাব। একশ টাকা দাও। আমি পিকনিকের জন্য সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি আর একটা পয়সাও তোমাকে খরচ করাব না।

• বেশ, যাব কোথায় ?

• গাবতলী থেকে কোথায় যাব, তুমি তা অনুমান করতে পার।

• এই নাও আমার একশ টাকা। কিন্তু অন্য জায়গায় গেলে হত না ?

• না। এতদিন শুধু তোমার কথা মেনে নিয়েছি। এবার আমাদের কথা মানতে হবে। কাল আমরা সেই বিলেই যাব। এই পচিঁশ বছর হয়ে গেল, তুমি একবারও দল বেধেঁ আমাদের যেতে দিলে না!

পরের দিন আখতারের দল একটা টেম্পো ভাড়া করে গাবতলী পার হয়ে আরিচার রাস্তা ধরল। পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে তারা এক ছোট বাজারে থামল। সেখানে পঁচিশ বছর আগে চাউল আটার একটা দোকান ছাড়া কিছু ছিল না। দোকানের পিছনে বিল। বুড়ো কাসেম চাচা দোকানটা চালাত। পিছনের বেড়ায় কেটেছিল ছোট একটা জানালা। জানালার সামনে রাতে কুপি জ্বলত। তার আলো চার-পাচঁ কিলোমিটার দূর থেকে দেখা যেত। যখন আলো নিভে যেত, তখন আখতারের দল জানত পাকিস্তান সেনারা ভোর বেলায় শিকারে বের হবে। কোন্ মন্ত্রের বলে কাসেম চাচা সৈন্যদের

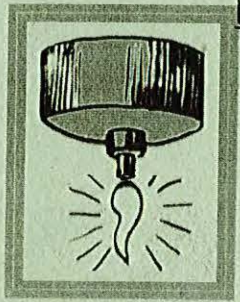

চলাফেরার খবর পেত তা কেউ জানে না। আট মাসের মধ্যে কুপিটা নিভে গেল দশ বার। তখন যে বিশ পঁচিশজন সৈন্য ভোর বেলা বিলের দিকে বের হত তারা আর কেউ ফিরত না। যারা কাসেম চাচার দোকানে আটা-চাউল কিনতে আসত, তারা শুধু বলত, "রাত্রে বিলে গন্ডগোল হয়েছে" তার অর্থ সবাই বুঝত।

গাড়ী থেকে নেমে আক্তার সাহেব এবার দলের নেতৃত্ব নিল। যুদ্ধের সময় আক্তার সাহেব দলের কমান্ডার হলেও কাউকে হুকুম করত না। শুধু প্ল্যান দেখিয়ে পরামর্শ করত, সবাই বুঝত তাদের কর্তব্য কি।

এবার কাসেম চাচার দোকানে বসে তারা চা খেল। কাসেম চাচা আর নেই। তার ছেলে দোকান চালায়। দোকানটা এখন বড়। বেড়ার পরিবর্তে তক্তা বসানো হয়েছে। বিলের দিকে চেয়ে সেই ছোট জানালা, জানালার সামনে সেই কুপি। তার নাম গ্রামবাসীরা দিয়েছে মরন কুপি।

দোকানের পিছনে, বিলের মধ্য দিয়ে গেছে একটা মেটো পথ। পচিঁশ বছর আগে সেই পথ ছিল না। আক্তার সাহেব রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, এই রাস্তায় কি রিক্সা চলে ?

· সাত কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে, নাম খোয়াভাঙ্গা। সেই পর্যন্ত খুব কষ্টে যাওয়া যায়।

· বেশ, আর পাচঁটা রিক্সা ঠিক কর, আমরা এক এক রিক্সায় একজন করে উঠব। ছয়টা রিক্সা এগিয়ে চলল। পৌছতে দেড় ঘন্টা লাগল। পৌছার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র সবাইকে কাজে লাগাল। তাদের ছ'জনের মধ্যে পাচঁজন প্রফেসারী করে। ইন্দ্র করে ব্যবসা। উপরন্তু ইন্দ্র সব রকমের হাতের কাজ জানে, আর রান্না-বান্না তো বটে, সুতরাং রান্না করতে গিয়ে সবাই তার নির্দেশ মেনে নিল। রান্না চাপিয়ে সবাই বিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। আস্তে আস্তে পচিঁশ বছর আগের সেই ভয়ানক স্মৃতি মনে আসতে লাগল। এই ডাঙ্গায় সেই প্রথম নৌকা এসে

পৌঁছেছিল। বের হয়েছিল বাইশজন পাঞ্জাবী সৈন্য, বয়স বিশ থেকে পঁচিশ। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, এক দল কিশোর ছাত্র যুদ্ধের খেলা করতে এসেছে। দুর্ভাগ্যবশত তার আগের সপ্তায় আর এক দল সৈন্য পাশের গ্রামে এসে দুজন যুবককে মুক্তিফৌজ বলে গুলি করেছিল। এরা একটা গুলি ছোড়ার সুযোগ পেল না। নৌকা পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের এক পাশে একটা পট্‌কা ফুটল। সবাই যেই তার দিকে মনোযোগ দিল, তাদের পিছনে চারটি গর্ত থেকে চারটি মেশিন গান বের হল ও নিপুণভবে তাদের সবাইকে শেষ করে ফেলল।

পরের সপ্তায় যে নৌকা এল সেটা পৌঁছাতে পারল না। থেমে গেল এক কিলোমিটার দূরে। ইন্দ্র, সেলিম, লুৎফর, সারা সপ্তা অভ্যেস করেছিল পানিতে ডুবে থাকতে। একটা নলের ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস টানত। নৌকাটা কাছাকাছি পৌঁছলে তার ভিতরে গ্রেনেড ছুঁড়তে হত। নৌকা

৪৭০। মানিক মিয়া ২

• ভাই, একটু থামবেন?... আমার বাড়ি এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। মাছ ধরতে এসে একটা সিং আমার পায়ে কাটা মেরেছে। হাটতে পারছি না। আর এই জায়গায় কোন রিক্সা পাব না।

• বেশ, উঠে আসুন। রিক্সাওয়ালার একটু কষ্ট হবে আর কি।

রিক্সাওয়ালা লোকটির বাড়ীতে পৌঁছল। গোলপাতার ঘর, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রিক্সাটা দেখে তার মেয়ে ঘর থেকে বের হল। পনের বছরের মেয়ে। সুন্দরী মেয়ে।

• আববা, কি হয়েছ! রিক্সায় কেন!

• কিছু হয়নি মা। একটা সিং আমার পায়ে কাটা মেরেছে। তোমার চাচা রিক্সায় উটিয়ে নিয়ে এসেছে।

• আস্‌সালাম আলাইকুম চাচা। নেমে আসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

আক্তার সাহেব নামতে চাচ্ছিল না, কিন্তু তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে হল । জিজ্ঞেস করল,

• আচছা ভাই, আমি সকলের শেষে আসছিলাম। অন্যদের বাদ দিয়ে আমার রিক্সা থামালেন কেন? আমি যদি না থামতাম, তাহলে আপনার কি হত?

• আমার খুব কষ্ট হত। কিন্তু অন্যদের থামিয়ে লাভ হত না। ওরা বলত, ভাই, রাস্তা খারাপ, আমি পারব না।

• তা কি করে বুঝলেন?

• আমার বয়স পঞ্চাশের উপর। তাছাড়া এ আমার একটা বিশেষ গুন, মানুষের মুখ দেখে তাদের মনের কথা বুঝি। আপনার মত লোক বেশী নেই... আর একজনের কথা মনে পড়ে... সে পঁচিশ বছর আগের কথা। তখন আমি পাকিস্তান আর্মিতে চাকুরী করতাম। সেদিন মেজর সাহেব

আমাদের পাঠিয়েছিল মানিক মিয়ার দল ধ্বংস করতে। মানিক মিয়ার কথা শুনেছেন তো? আমরা ছিলাম ত্রিশজন। কেউ ফেরেনি। হঠাৎ পানির ভিতর থেকে বের হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের নৌকার মধ্যে তিনটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ডুবে গেল। যারা বেঁচে ছিল, তারা গুলি খেয়ে মরল। আমি পানির তলে সাঁতার কাটতে লাগলাম, আমার অভ্যাস ছিল। কিন্তু পা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল তাই আমার অবস্থান সবাই টের পেয়ে যাচ্ছিল। সব দিক থেকে গুলি আসতে লাগল। শেষে আমি পানির ভিতর থেকে মাথা তুললাম। তিনটি ছোট নৌকা আমার দিকে আসছিল। বুঝলাম আমার দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে। তবু একটা নৌকার দিকে সাঁতার কাটলাম। লোকটির চোখে দয়া-মায়া ছিল। যেই কাছে এলাম তার সঙ্গী আমার দিকে বন্দুক তাক করল।

লোকটি বলল, থাম!... হাত বাড়িয়ে আমাকে নৌকায় উঠিয়ে নিল। তার সঙ্গী বলল, এই লোকটা বিহারী, রাজাকার। লোকটি বলল, সে এক আহত মানুষ। তাই আমি বেঁচে আছি। আমি যদি ভুল মানুষের দিকে যেতাম তাহলে বাচঁতাম না।

আক্তার সাহেব চা খেয়ে চলে গেল। যুদ্ধের সময় তার নাম ছিল মানিক মিয়া। আজ এই লোকটিকে দেখা মাত্র সে চিনে ফেলেছিল।

৪৭১। রেল লাইনের পাশে

আমি জন্মেছি রেল লাইনের পাশে। ঐ যে আস্তানা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছ, সেখানে আমার জন্ম। শিশুকাল থেকে ট্রেন হর্ণ বাজিয়ে আমার কান ফাটিয়ে চলেছে, রাতে শিয়াল কুকুরের ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গে। বর্ষাকালে আমার ঘরের তলে পানি বাড়ে, সেখানে লোকে পায়খানা প্রস্রাব করে, দুর্গন্ধে মুখে বমি আসে, বাচ্চারা পানিতে পড়ে গিয়ে আর ওঠে না।

কতবার না খেয়ে ছিলাম তার হিসাব নেই। কতবার একটা রুটির জন্য ভাইয়ার সঙ্গে লড়াই করেছি! সে ছিল আমার ছোট... এখন আর লড়াই হবে না, সে মারা গেছে। আমার মন কাঁদে, কিন্তু কার কাছে মাফ চাব? সে আর নেই।

পথে ঘাটে একটা মুখের হাসি খুঁজে মরি, কিন্তু কারও মুখে হাসি নেই, ওরা বলে, তুমি কে? তোমাকে চিনি না। ওরা তো চেয়েই দেখে না, চিনবে কি করে...?

শুধু হাসে সেই গামছা পরা মেয়ে। পাগলীটি খাবারের খোঁজে সবার ঘরে আসে। আমরা দিই তাকে একটু করে মুড়ি, বাবা-মায়েরা তারে শুধু বকে ও দূর করে দেয়।

৪৭২। আমার কত কাজ!

বাবা-মা বলে আমি অলস, আমি কুড়ে! আমার কাজ না দেখে তারা কেন বিচার করে? ঝড় তুফানে যখন পাখির বাসা উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন কে আবার খড় কুড়িয়ে ফের বাসা বানায় ও গাছে উঠে বসায়? আমি না করলে এ সব কাজ করবে কে?

বাপ্পার দাদা যখন লাঠিতে ভর দিয়ে আসে, তখন কে তাকে সাঁকোর উপর দিয়ে খাল পার করিয়ে দেয়? আমি না করলে এ কাজ করবে কে শুনি?

বর্ষার শেষে পাখিরা ঝাক বেঁধে বিদেশ থেকে আমাদের বিলে নেমে আসে ও চির চির করে মেলা বসায়। তখন শিকারী যদি বন্দুক নিয়ে তাদের মারতে আসে, কে হেঁকে হেঁকে তাদের সাবধান করে দেয়? কে ঢিল মেরে তাদের তাড়িয়ে দেয়? আমি ছাড়া এ সব কাজ করবে কে শুনি? তাহলে বাবামা কেন বলে আমি অলস, আমি কুড়ে?। আমার কাজ না দেখে তারা কেন বিচার করে?

এর পরে অনেক দিন কেটে গেল। নাজমা আপার বিয়ে হল, তার ছেলেমেয়ে হল, সে অন্যান্য জায়গায় মাষ্টারী করতে গেল। একদিন বাপের বাড়ী ফিরে এসে বিশ বছর আগের সেই স্কুল ঘর দেখতে এল। স্কুলঘর সেখানেই ছিল, তবে আগের চেয়ে বেশ বড়। স্কুলঘর পাকা হয়ে গেছে, ক্লাস একটা নয়, তিনটে। আপা যখন গেল তখন ক্লাস চলছিল। নাজমা আপা দূর থেকে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা ঘর থেকে লাইন করে আপার পিছনে বেরিয়ে এল ত্রিশজন ছাত্র। তারা খেলার মাঠের শেষ প্রান্তের দিকে হাঁটতে লাগল। আপার হাতে ছিল একটা বাক্স। আপার মুখ... ঠিকই তো ! আপার মুখ সেই চিকন ইয়াসমিন মেয়েটার মুখের মত...

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে নাজমা আপা দরজা দিয়ে উঁকি মারল। ইয়াসমিন তাকে চিনে ফেললঃ- নাজমা আপা ! আপনি!

• ইয়াসমিন, তুমি যে একদিন এই কাজ করবে, তা আমি ভাবি নি!

• কেন?... পারিনা তো মারা গেছে... মনে নেই?... আজ আমরা তার মৃত্যু দিবস পালন করলাম। এই দেখুন, আমার ছাত্ররা যখন বলে, আমি পারি না, তখন তাদের হাতে একটা ফুল দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিই মাঠের ঐ প্রান্তে তার কবর সাজাবার জন্য। তারা গিয়ে কি করে, রাবেয়া, বল তো?

• তারা কবরে কান লাগায়। বলে, তুমি কি সত্যি মরেছ? তারপর উঠে বলে, তুমি যদি মরে থাক, তাহলে আমি সবই পারি। তারপর ক্লাসে এসে সবাইকে বলে, ভাইসব জান? পারিনা মারা গেছে, এখন আমরা সবই পারি। তারা উঠে দাড়িয়ে উত্তর দেয়, এখন আমরা পারি সব!

৪৭৩। পারি-না মারা গেছে

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। নাজমা আপা ছাত্রদের ধরে রাখতে পারছিল না। নজরুল তার অংক পারছিল না, খোকন তার বাংলা পারছিল না, বাবুল তার ইংরেজী পারছিল না। আজ যেন কেউ কিছু পারছে না। নাজমা আপা বকতে বকতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। তার সামনে উচু নিচু বত্রিশটা মাথা, বয়স আট বছর থেকে চৌদ্দ। তাদের বয়সী যারা তারা হাইস্কুলে পড়ে আর এরা পড়ে ক্লাস ওয়ানে। তাদের জীবনে এই এক বছর, রোজ দুই ঘন্টা ধরে যা শিখে যাবে, যা পেরে যাবে, তার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানবে না। তাদের সারা জীবনের মান নির্ভর করে এই দু'ঘন্টার উপর। আর এরা বলে কি না, পারি না, পারি না, পারি না। লাট সাহেবের বাচ্চার মত!

হঠাৎ নাজমা আপার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। বলল,

• বই-খাতা বন্ধ কর। চোখের পলকে বই-খাতা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আপা পাটিতে বসবে, তারপর একটা মজার গল্প বলতে শুরু করবে..........

কিন্তু আপা বসল না। ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে একটা পুতুল আঁকল। তার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখল, "পারি-না"।

• এই লোকটাকে চেন ? তার নাম পারিনা। এই লোকটা সারাদিন তোমাদের সঙ্গে থাকে। ভেবে দেখ আজ কয় বার তোমরা তার নাম বলেছ ?.......... এবার শোনঃ আমি সবাইকে একটা করে পাতা দেব।

কিন্তু তার আগে চোখ বন্ধ কর। তোমরা কি করতে পার না তাই ভেবে দেখ.... এবার নাও, তোমরা কি কি পার না তাই লেখ।

ছেলেমেয়েরা লিখতে শুরু করল। অঙ্ক পারি না, বাংলা পারি না, ফুটবল খেলতে পারিনা, রান্না করতে, চুল বাধঁতে, সেলাই করতে, গাছে উঠতে, লড়াই করতে, সাইকেল চড়তে .....তাড়াতাড়ি পাতাগুলো ভরে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে নাজমা আপা পীচবোর্ডের একটা বাক্স তৈরী করেছে। এবার নাজমা আপা বোর্ডে গিয়ে পুতুলের গায়ে কোনাকুনি দুইটি দাগ করে দিল।

• এই দেখ আজ পচাঁনব্বই সালের ১৫ই জুলাই পারিনা মারা গেছে। পারিনা আর নেই। পরিচিত লোক মারা গেলে সবাই কি করে ?

• সবাই কাঁদে।

• তা হলে এখন আমরা কাঁদব।

ছেলে-মেয়েরা কাঁদতে শুরু করল। দু' একজন আবার কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, হায়রে! লোকটি কত ভাল ছিল রে, এখন আমাদের কি হবে রে... তিন-চার মিনিট এভাবে সবাই কাঁদতে লাগল।

• মানুষ মরে গেলে দুঃখ করার পর লোকে কি করে ?

• কবর দেয়।

• বেশ, তাহলে তোমাদের কাগজ এই বাক্সের ভিতরে নিয়ে এস। আমরা পারিনা-এর কবর দিয়ে আসব। এস, একজন করে তোমাদের কাগজ নিয়ে এস। ছেলে-মেয়েরা চুপে চুপে তাদের পাতা বাক্সের ভিতরে এনে রেখে দিল। শেষে নাজমা আপা ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। এরই মধ্যে পাশের বাড়ী থেকে নজরুল একটা কোদাল নিয়ে এসেছে। বৃষ্টি শেষ হয়ে গিয়েছিল। নাজমা আপা ধীরে ধীরে, বাক্সটা নিয়ে, স্কুল ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল খেলার মাঠের শেষ কোনের দিকে। সবাই লাইন করে তার পিছু পিছু হাটল।

কবর খোঁড়ার সময় সকলে পর পর কোদাল ধরল। শেষে গর্তটি দুই ফুটের মত গভীর হলে নাজমা আপা বাক্সটা ভিতরে নামিয়ে দিল ও পারিনা-এর মৃত্যু উপলক্ষ ভাষণ দিল।

• ছোট ভাইবোনেরা, যে লোকটি মারা গেছে সে আমাদের সঙ্গে অনেকদিন ছিল। সে লেখাপড়ার পথে ও জীবনের পথে হাজার বার আমাদের থামিয়ে রেখেছে। আমরা শিখতে চেয়েছিলাম আর সে বলত, তুমি পারবে না। তখন আমরা থেমে যেতাম। আমরা পড়তে চেয়েছিলাম আর সে বলত, তুমি পারবে না, তখন আমরা থেমে যেতাম। আমরা গাছে উঠতে চেয়েছিলাম, দৌড়াতে চেয়েছিলাম, বল খেলতে চেয়েছিলাম, আরও কত কি করতে চেয়েছিলাম, আর সে বলত, তুমি পারবে না। তখন আমরা থেমে যেতাম...। এখন কিন্তু পারিনা মারা গেছে। তার আর কোন ক্ষমতা নেই। এখন বেঁচে আছে মাত্র তার দুই ভাই। মেঝো ভাইয়ের নাম হল চেষ্টা করব আর ছোট ভাইয়ের নাম আমি পারব। তাদের নিয়ে আমরা জীবনের পথে এগিয়ে যাব। চল, আমাদের কাজ শেষ করি।

অল্পক্ষণের মধ্যে সবাই মিলে গর্তটা ভরে দিল। নাজমা আপা তার উপরে একটা ইট বসাল। তাতে লেখা ছিলঃ- পারিনা, ১৫/৭/৯৫। তারপর সবাই হৈ চৈ করতে করতে স্কুল ঘরে ফিরে এল। সেখানে মুড়ি বাতাসা দোকান থেকে এনে সবাই পারিনা-র মৃত্যু দিবস পালন করল।

৪৭৪। আমার কাঁঠাল

চার বৎসর আগের কথা। এক দিন আমি আব্বার সাথে বাজারে যাই। গিয়ে দেখি খুব বড় একটা কাঁঠাল। বললাম, বাবা ওটা কিনে নাও, সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়াব।

দোকানদার কাঁঠালের দাম বলল চল্লিশ টাকা। বাবা ত্রিশ টাকায় কিনে নিল। বাড়ি এসে দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাইকে দাওয়াত করলাম। কাঁঠালটা ভেঙ্গে দেখি খুব ভাল কোঁয়া, খেতেও খুব মজা। সবাই বাঃ বাঃ করতে লাগল। আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল। এই কাঁঠালের বীজ লাগালে নিশ্চয় ভাল কাঁঠাল হবে। ঘরের পিছনে একটা বাগান ছিল। কয়েকটি বীজ পুঁতে দিলাম, বেড়াও দিলাম, চারা হলে যেন গরু-ছাগলে না খায়। দিন যায়, মাস যায়। একদিন গিয়ে দেখি চারা বের হয়েছে। দেখতে দেখতে কাঁঠাল গাছটা বড় হল।

তারপর চার বছর পার হয়ে গেল। একদিন গিয়ে দেখি গাছে মুন্‌চি ধরেছে। মনের আনন্দে বাবা-মা, ছোট ভাই, সবাইকে ডেকে কাঁঠালের মুনচি দেখালাম।

মুনচি থেকে আস্তে আস্তে কাঁঠাল হল। একটাই কাঁঠাল। আমার গাছের কাঁঠাল। প্রত্যেক দিন দুই ভাই দেখে আসতাম কাঁঠাল কত বড় হল, নরম হচ্ছে কি না। আমি বলতাম, এই কাঁঠাল পাকলে, দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাইকে দাওয়াত দেব। সবাই আমাদের কাঁঠাল খাবে।

কিন্তু একদিন সকালে ছোট ভাইয়ের কান্না শুনতে পেলাম। সে কি কান্না! শুধু চোখ মোছে আর কেঁদে কেঁদে বলে, আমাদের কাঁঠাল, আমাদের কাঁঠাল! আমি দৌড়ে গেলাম। দেখে আমার চোখেও পানি এল। চোরকে কাছে পেলে কি করতাম জানি না, তবে সেদিন বুঝলাম নিজের রোপন করা কাঠাল চুরি হয়ে গেলে মানুষের কত কষ্ট হয়। চোরের কোন মমতা নেই, কোন দয়া নেই, কোন মায়া নেই!

৪৭৫। বটি ধরা

আমাদের বাগানে নতুন শসা হয়েছিল। আমি প্রথমে ছাল্ শুদ্ধ গোপনে গোপনে ছোটগুলো খেতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে ছাল তিতা হতে লাগল। একদিন মাঝারি একটা শসা তুলে এনে বটি দিয়ে ছিলতে লাগলাম। মা কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল, তারপর বলল, দেখ মীনা, অনেক মেয়ে আঙ্গুল কেটে ফেলেছে ঐভাবে শসা ছিলতে গিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার একটা আঙ্গুল মাটিতে পড়ে যাবে, আর তুমি জিজ্ঞেস করবে ঐ আঙ্গুলটা কার ?

আমি হেসে ফেললাম। মা বলল, হাসবার কিছু নেই মা। ঐ ধরণের বটি আবিষ্কার করতে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে, উন্নত করতে, ব্যবহার করা শিখতে মানুষের এক হাজার বছর লেগেছে। তার মধ্যে কত হাজার মানুষ আঙ্গুল কেটেছে তার ঠিক নেই। এখন আর কেউ আঙ্গুল কাটে না। একা একা তার ব্যবহার শিখতে তোমার এক হাজার বছর লেগে যাবে, আর না জানি তোমার কয়টা আঙ্গুল যাবে। এদিকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে যেকোন মেয়ে তোমাকে বলতে পারে কেমন করে বটি ধরলে আঙ্গুল কাটে না। তুমি কিছু না জেনে যদি একটা আঙ্গুল কেটে ফেল, ওরা কি বলবে জান ? তোমার মত বোকা মেয়ে জগতে নেই। এখন সারা জীবন তোমাকে নয়টা আঙ্গুল নিয়ে থাকতে হবে।

করে না?.....   সবাই চুপ করল। মিজু এবার ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি? ছেলেটা অবাক হয়ে চেয়ে রাইল। কবে থেকে ওর নাম জিজ্ঞেস করে না কেউ...।

- আমার... নাম?....... আমার নাম সিজু
- আমার নাম মিজু। এস।

মিজু একটু দূরে গিয়ে বসল। বলল, ভিক্ষে কর কেন?

- কাজ পাচ্ছি না। কালু মিয়া গরু বেচে ফেলেছে। আগে তাদের গরু চরাতাম, ওরা খেতে দিত। আমার কেউ নেই, বাবাও নেই, মাও নেই।

মিজুর থালায় এখনও অর্ধেক ভাত ছিল। বলল, খাবে?

সিজু হাত বাড়াল। এক মিনিটের মধ্যে থালাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

ছেলেরা আবার চারদিকে জড়ো হয়েছে। সবাই চোখ মোটা করে চেয়ে রয়েছে। ক্ষুধা কাকে বলে ওরা জানত না। আর এত অসহায় মানুষ যে জগতে আছে, তাও ওরা জানত না।

হঠাৎ মিজু বলল, এটা কিন্তু অন্যায়! আমাদের সব কিছু আছে, ওর কিছু নেই!...   সবাই চুপ করে রইল, অনেকক্ষণ... শেষে মিজু বলল, কিছু একটা করতে হবে। আমাকে সাহায্য করবে কি না বল?

সবাই বলল, করব। মিজু তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। মাকে বলল, মা এই ছেলের নাম সিজু। সে আমার ভাই হয়। ওকে বাড়িতে রাখতে হবে, আর আমার ক্লাসের ছাত্ররা তার লেখাপড়ার ভার নেবে। মা বলল, তোমার বাবার মত্ শুনতে হবে না?। মিজু বলল, না মা, বাবা যদি তাকে খাওয়াতে না পার সে আমার থালার অর্ধেক ভাত খাবে।

৪৭৬। গ্রামে ফিরে আসা

দশ বছর পর বিমল গ্রামে ফিরে এলো। পণ করেছিল একদিন গ্রামে ফিরে আসবে। মোটর-রিক্সা চালিয়ে এম. এ পাশ করেছে। শুধু পাশ করেনি সে, দিন রাত বই পড়েছে। ঢাকায় যত চিন্তাশীল লেখক ছিল সে তাদের বই গ্রাস করে ফেলেছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছে, তর্ক করতে গিয়েছে। এবার গ্রামে ফিরে এসেছে। কিন্তু ফিরে এসেছে কাকে দেখতে? কি করতে? বাবা-মা ভাই-বোন সবাই ঢাকার মানুষ হয়ে গিয়েছে। গ্রামে তার আর কেউ নেই...। কেউ নেই?.. ঐ নীল শাড়ী পরা বুড়িটি কে?   রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, নাম মনে নেই। সবাই ওকে খালাম্মা বলে ডাকে। সে আমাকে ক্লাস থ্রী পর্যন্ত পড়িয়েছিল। আজকাল তার মত শিক্ষক হয়না।

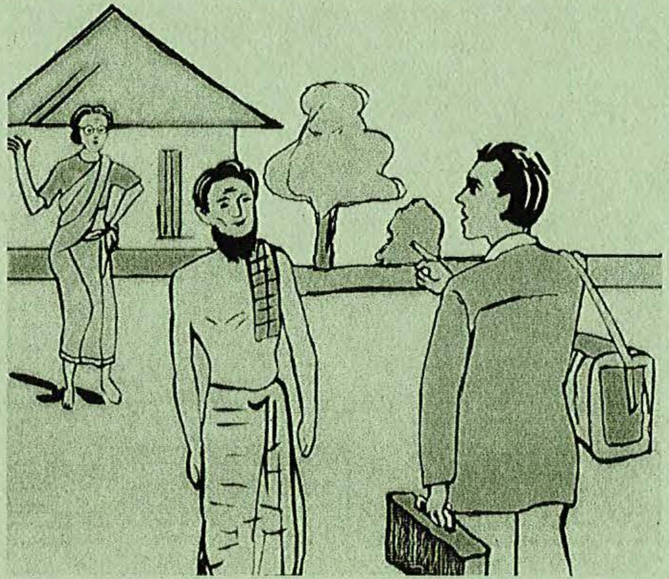

বিমল নেমে গেল। তার সামনে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল,

- খালাম্মা, আমাকে চিনতে পারছেন?
- বিমল, বাবা আমার, তোমাকে চিনব না তো কাকে চিনব? তাঁর চেহারা স্নেহে ভরে গেল। কার কাছে এলে?
- ঠিক নেই, ভেবেছিলাম কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠি, তারপর না হয় একটা ব্যবস্থা হবে।

• কেন? আমার কাছে থাকলে কি দোষ? কতদিন বা থাকবে?
• থাকার জন্য তো এসেছি।
খালাম্মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল,
• স্যুটকেসটা নামাও, গ্রামটা ঘুরে এস। এক্ষনই ডাল-ভাত হয়ে যাবে।
বিমল শার্ট প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পড়ে বের হল। স্কুলঘর দেখতে গেল। স্কুল ঘর এখনও সেখানে আছে। চাল নেই, ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কাকা এল। বিমল জিজ্ঞেস করল, কাকা, গ্রামটা দশ বছর আগের চেয়ে বড় হয়েছে। তা..... স্কুলটা গ্রাম থেকে উঠে গেল কেন?... কাকা তিক্ত সুরে বলল, বিমল, লেখাপড়া হচ্ছে ভদ্রলোকের কল, ভদ্র লোক তৈরী করার জন্য, যাতে ভাল চাকরি পায় আর ভাল টাকা পায়। আমরা ভদ্রলোক নই। এখানে স্কুল থাকা আর না থাকা একই কথা। এই জন্মে তো আর আমরা ভদ্রলোক হব না... বিমল চোখ বড় করে চেয়ে রইল, বলল, ভদ্রলোক নাইবা হলাম, মানুষ তো হতে পারি। বলেই সে খালাম্মার কাছে ফিরে এল। এসে কাকার কথা বলল।
খালাম্মা চোখ মুঁছল, ধোঁয়ার জন্য, না কি জন্য, বিমল বুঝতে পারলনা। শেষে বলল, তোমার কাকা ঠিক বলেছে। এই দেখ, আমিও বর্তমানে জ্ঞান বেচে থাকি ভদ্র লোকের ছেলেমেয়েদের কাছে। তারাই আমাকে খাওয়ায়। কেউ বলেনি তোমাকে? টিউশনি করে বাঁচি আমি। খালাম্মা আবার চোখ মুঁছল। এবার বিমল বুঝল, তার চোখের জল ধোঁয়ার জন্য নয়। খালাম্মা বলতে লাগল, এখানে গরীব-ধনী মিলে, ফাও নিষ্ফল টিউশনির জন্য যে টাকা খরচ করে তাতে একটা কেন, দুটি স্কুল চলত। তাতে গরীবদের ছেলেমেয়েরা বই পড়া শিখত, একটা লাইব্রেরী চলত, একটা নাইট স্কুল চলত, সবই চলত। কিন্তু ভদ্রলোকেরা এই কথা শুনবে কেন? ইউনিয়ন বোর্ডে ওরাই বসে, ওরাই গ্রাম চালায়।

বিমল নীরব হয়ে রইল। রান্না হয়ে গেল, দুজনে খেতে বসল। হঠাৎ বিমল বলল, খালাম্মা, একটা উপায় আছে। গরীবদের জন্য আমরা এমন একটা স্কুল চালাব যে, ভদ্র লোকেরা এসে আমাদের পায়ে ধরে বলবে, আমরা টাকা দিচ্ছি, আমাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি কর। আমি ছয় মাস খেয়ে বাঁচার মত টাকা এনেছি। ছয় মাসের মধ্যে কি ওদের বুঝাতে পারবনা যে, এখানকার ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হলে টিউশনি বাদ দিয়ে একটি সত্যিকারের স্কুল চালাতে হবে? পারব না খালাম্মা?
খালাম্মা বিমলের মুখের দিকে অনেক্ষণ চেয়ে রইল। নিরবে ভাত বেড়ে দিল। চোখ মুছল। তারপর হাসল। বলল, পারব।

৪৭৭। বড় লোকের ছেলে

মিজু ও তার সাথীরা বড় লোকের ছেলে। তাদের স্কুলের পোষাক দেখে বুঝা যায়। আজ বনভোজন করতে ওদের প্রত্যেকের একশ টাকা খরচ হয়েছে। তাদের গাড়ির পাশে বটগাছের তলে খেতে বসেছে সবাই। এমন সময় দশ বছরের এক ছেলে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে এল। তার পরনে একটা ছেঁড়া প্যান্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। হঠাৎ তাদের একজন তার দিকে একটা বরইর আটি ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেখা দেখি সবাই ঠাট্টা-তামশা শুরু করে দিল। মিজুর রাগ হল। বলল, আচ্ছা বাবুল, খেতে নাইবা দিলে, ওকে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা

৪৭৮। ওষুধ

রহিমের মামা মরতে বসেছে। তার বয়স ৮০ বছর। রহিম মামাকে দেখতে এল। মামা বলল, সম্পত্তি যা ছিল, তা ছেলেমেয়েদের দিয়ে গেলাম। তোমার জন্য সবচেয়ে দামী জিনিসটা রেখে দিয়েছি। আমি যা বলব তা যদি মনে রাখতে পার, তবে তোমার কপাল খুলে যাবে। শোন, আজ থেকে তুমি ডাক্তারী করবে। এই নাও, এই কাগজে পাঁচটা ঔষুধ তৈরী করার নিয়ম লেখা আছে। তুমি শিখে নাও।

ধর, তোমার রোজ একশো রোগী হল। তাদের মধ্যে ত্রিশ-জনের রোগ বলতে কিছু নেই। আর ত্রিশজনের অসুখ এমনি সারে। কিন্তু ঔষুধ না খেলে ওরা শান্তি পায়না, কারণ, দিনের পর দিন আমরা তাদের শিখিয়ে দিয়েছি, অসুখ এমনি সারে না, ডাক্তার দেখাতে হয়, ঔষুধ খেতে হয়। এ সব রোগীর জন্য তিন রঙের তিনটা মিক্চার বানাবে। তিন কলসী পানি নেবে। প্রথমটায় দেবে শিউলী ফুলের বোটার রস। হলুদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টায় দেবে লাল শাকের রস। লাল হয়ে যাবে। তৃতীয়টায় দেবে সীম পাতার রস। সবুজ হয়ে যাবে। তোমার পনের দিনের মিকচার হয়ে গেল। রোগী প্রতি, গড়ে এক শিশি মিকচার দেবে। বিশ টাকা করে নেবে। তারপর পুরিয়া বানাবে ও রোগীর সামনে ছোট একটা শিশি থেকে তিন ফোটা পানি মিশিয়ে দেবে। তিন বেলা খেতে বলবে। পঁচিশ টাকা করে নেবে। ইন্‌শাল্লাহ তারা সেরে উঠবে।

শতকরা ত্রিশ জন হল সত্যিকারের রোগী। তাদের জন্য পাঁচটা ওষুধ আছে। গাছ গাছড়া

দিয়ে বানাতে হয়। প্রতি রোগীর জন্য পাঁচ টাকা করে খরচ করবে। তুমি চল্লিশ টাকা করে নেবে। বলবে, আমার দশ টাকা হারে লোকসান হচ্ছে, তুমি বলে এত কম নিলাম। মনে থাকে যেন, ওষুধের দাম কম নিলে রোগীদের অসুখ সারবে না। তোমার দূর্নাম হবে। তোমার ব্যাবসা ধংশ হয়ে যাবে।

বাকী দশ জন রোগী তোমার ওষুধ খেলেও মরবে, না খেলেও মরবে। তাদের দুই রঙের দুই বোতল মিকচার দিও। আর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে বল। এরা তোমার দুর্নাম করার সুযোগ পাবে না। ওষুধ খেয়ে মরে যাবে ইনশাল্লাহ্।

একটা কথা যেন মনে থাকে। ওরা যদি পায়খানা ঘর তৈরী করে, বেশী পাকসাফ থাকে, ঝাল খাওয়া ছেড়ে দেয়, কলের পানি খায় আর বেশী করে ডাল-শাক খায় তাহলে কিন্তু ওদের বিশেষ কোন রোগ হবে না। তখন তুমি বিপদে পড়বে। হুঁশিয়ার ভাগনে, এসব গোপনীয় বিষয় কেউ যেন জানতে না পারে, সেদিকে আমি সব সময় নজর রেখেছি, তুমিও তাই কর।

এই শেষ কথা বলে রহিমের মামা মারা গেল। রহিম বলল, 'ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন'। জানাজার নামাজ পড়ে রহিম বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ি গিয়ে বউকে ডেকে বলল, তিন কলসী পানি আন...

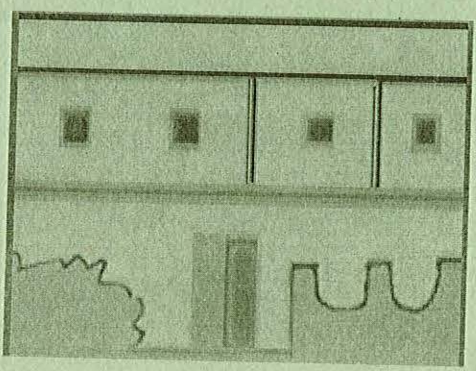

এখন রহিম সপরিবারে দোতলা বাড়ীতে থাকে।

জামের মৌসুম ফুরিয়ে গেল। একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি ফরিদা রাস্তার সেই মোড়ে বসে আছে। আমার মন যেন লাফিয়ে উঠল।

সারা বছর ফরিদা রাস্তার সেই মোড়ে ঠিক সময় এসে বসল।

এরপর এক সময় সে স্কুলে ভর্তি হল, আর আমরা দুজনে বড় হতে লাগলাম বটে! কতবার যে তার জন্য মারামারি করেছি তার ঠিক নেই। কেউ যদি ওকে টেরী বলে ডাকত, কেউ যদি তাকে আমার কথা বলে ক্ষেপাত, কেউ যদি তার সঙ্গে বেশী ভাব জমাত, তাহলেই লড়াই বেঁধে যেত। সময় সময় ঘাঁ-গুতার ব্যথা সারতে সারা সাপ্তা লেগে যেত, তাতেও দুঃখ নেই।

তারপর একদিন তার বয়স হল বিশ, আমার বয়স তেইশ। তখন বাবা বলল, তোমার জন্য মেয়ে দেখে এলাম। আমি হাসলাম, মেয়েটা কে জিজ্ঞাসা করি নি। আমাদের বিয়ের চুক্তি হয়ে গিয়েছিল সেই ষোল বছর আগে, ঐ রাস্তার মোড়ে, যখন আমি দুঃখে পড়ে বন্ধুর খোঁজে বেরিয়েছিলাম। সে সময়ের পর থেকে কার সঙ্গে ফরিদার বিয়ে হবে তা সবাই জানত। আর সে কারণেই যখন নান্নুর চোখ দেখে লোকে অবাক হয়, তখন আমি তার মায়ের দিকে চেয়ে বলি, ছেলেটা কার, তা তো দেখতে হয়!

৪৭৯। ডোম

বংশী মেথর ভুলুর কাছে গেল। বংশীর সংগে ভুলুর খুব খাতির। ভুলু চেয়ার এনে তাকে বসতে দিল। নিজের হুক্কায় তাকে তামাক খেতে দিল। এমন সময় কালু মিয়া এল। বংশী চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভুলু বলল, বসে থাক। একটা টুল এনে কালুকে বসতে দিল। কালু রাগ করে চলে গেল।

বংশী হাসল। বলল, গত সপ্তায় এম,পি,সাহেব আমাকে ডেকেছিল। এক ঘন্টা বারান্দায় বসিয়ে রাখল। আমি রাগ করে চলে এলাম। তিন দিন পর আবার গেলাম। এম.পি সাহেব বলল, তুমি একটা অসভ্য। আমি উত্তর দিলাম, আপনি কি সভ্য ?

এম,পি, সাহেব ক্ষেপে গেল। বলল, এত বড় সাহস! তুমি আমাকে চেনো না? আমি বললাম, চিনি, আপনি একজন মানুষ, আমিও একজন মানুষ। এম, পি, সাহেব বলল, মানুষের মধ্যে তফাৎ আছে, আমি তোমার মত ময়লা ঘাঁটি না। আমি বললাম, কেন? আপনি কি সকালে পায়খানা করেন না? কে আপনার পাছা ধুয়ে দেয়?

বঁংশীর কথা শুনে ভুলু হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, বংশী, যেও না, ভাই। গরীবের বাড়ীতে দুটো নুন ভাত খেয়ে যাও। বংশী বলল, না বন্ধু, কালু মিয়ারা তোমাকে এক ঘরে করে দেবে। ভুলু বলল, তাতে আমার কিছু আসে যায় না! আমি কারো ধার ধারি না। যারা বসে বসে খায় তাদের মুখে আমি ঝাটা মারি। যারা কাজ করে খায় তারাই আমার বন্ধু, তাদের আমি সালাম করি।

৪৮০। নান্নুর মা

আমার ছেলের নাম নান্নু। তার বয়স চার বছর। তার দু'চোখের মত চোখ সারাটা গ্রামে আর কারও নেই। তার দু'চোখের একটা ইতিহাস আছে। আমার বয়স যখন সাত বছর তখন আমার একটা মাত্র বন্ধু ছিল, তার নাম কিম, আমার ছোট্ট বিড়াল। প্রত্যেক দিন স্কুল থেকে আসার সময় সে থাকত রাস্তার মোড়ে। স্কুলে আমার কোন শান্তি ছিল না। আমি প্রায় বকুনি খেয়ে, মারামারি করে, মন খারাপ করে স্কুল থেকে ফিরে আসতাম। কিম আমার গায়ে লাফ দিয়ে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দিত। একদিন সে গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেল। আমি অনেক দিন কাঁদলাম। ভাবলাম, কোনদিন তার মত বন্ধু আর পাব না।

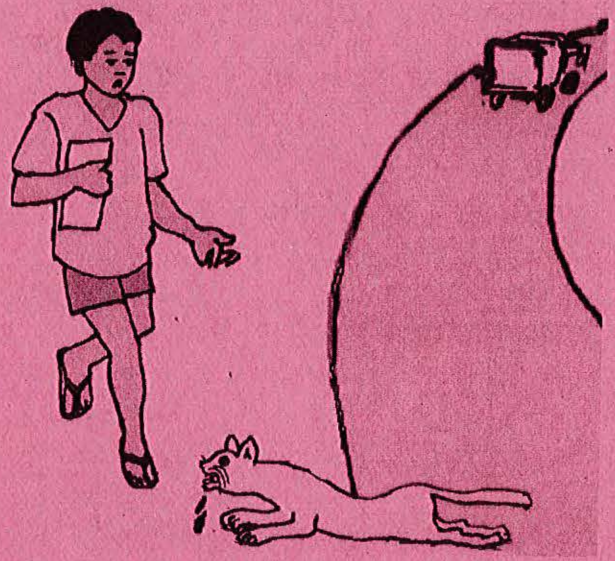

এক সাপ্তা পরেও মন মরা হয়ে স্কুল থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন দেখি ঠিক সেই জাগায় বসে আছে একটা মেয়ে। চার বছরের মেয়ে। তার নাম ফরিদা, তার চোখ টেরা। সবাই তাকে টেরী বলে

ডাকত। সেও সুন্দরী হবার জন্য বা ভাল লাগার জন্য কোন চেষ্টা করত না। জংলীর মত কাউকে সামনে পেলে ইট পাটকেল মারত। সেদিন আমাকেও দেখে একটা ঢিল হাতে নিল। আমার মন এত খারাপ ছিল যে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। ভাবলাম, মারে মারুক, জগতে আমার আর কোন বন্ধু নেই, বেঁচে থেকে কি লাভ?

ফরিদা ঢিল মারল না। আমি বাড়ী এসে বই রেখে সেখানে ফিরে গেলাম। অন্ততঃ ঐ টেরা মেয়েটা যদি আমার সঙ্গে ভাব জমাত...... স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় যদি কেউ আমার পথ চেয়ে থাকত.....। ফরিদা সেখানেই ছিল। আমি একটু দুরে বসলাম। সে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিছু বলল না। আমিও কিছু বললাম না।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরে ওদের বাড়ী গেলাম। হাতে দু'টো জাম। ফরিদা উঠানে বসে একা একা পাঁচ গুটি খেলছিল। আমি একটা জাম খেয়ে আর একটা তার পিঁড়ির উপর রেখে চলে এলাম। পরের দিনও তাই করলাম। তারপর দিন গিয়ে দেখলাম সে আর খেলা করছে না। পিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছে। আমি কাছে যেতেই হাত বাড়িয়ে বলল, দাও। আমি হাসলাম। সে হাসল না, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য! তার দুটি চোখ কি সুন্দর!

ওর মা আমাদের লুকোচুরি খেলা দেখছিল। একদিন এসে দেখি ফরিদার রূপ পাল্টে গেছে। তার চুল আঁচড়ানো, রঙ্গীন ফিতা দিয়ে বাঁধা। তার মুখ পরিস্কার, জামাও পরিস্কার। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলাম।

তখন ফরিদা হাসল... এর আগে তাকে কোনদিন হাসতে দেখিনি। তাকে এবার সত্যি সত্যি সুন্দরী দেখাচ্ছিল। টেরা হলে কি হয়, মনে মনে তাকে আমার খুব ভাল লাগল।

৪৮১। পোড়া ঘা

দুলুর বয়স সাত বছর। এক দিন গোসল করতে গিয়ে দেখল বুবুর দু'হাতে পোড়া ঘায়ের দাগ। দেখতে বিশ্রী লাগে। বুবুকে সে ভালবাসে, তাই কিছু বলল না। তারপর দুলু ব্যাপারটা ভুলে গেল। বুবু সব সময় দু'হাত ঢেকে রাখে।

একদিন কিন্তু বুবুর সঙ্গে তার ঝগড়া হল। দুলুর বই পড়ার ইচ্ছা নেই। বুবু জোর করে পড়াতে চাচ্ছে। তাকে মারতে ইচ্ছা হয়। অনেক কথা কাটাকাটি হয়। আব্বা শুনে কিছু বলেনা, দুই ভাইবোনের ঝগড়া এমনি মিটে যায়। এবার কিন্তু দুলু ছাড়ে না। বুবুকে আঘাত করার জন্য মনে মনে কিছু খোঁজে। শেষে তার সেই কথা মনে পড়ে ঃ- তুই বিশ্রী, তোর দু'হাতে পোড়া ঘায়ের দাগ।

হঠাৎ ঝগড়া থেমে গেল। বুবুর চোখে পানি এল। বাবা তার দা ফেলে রেখে উঠে এল। মা রান্নাঘর থেকে বের হল।

দুলু কিছু বুঝতে পারছে না। বাবার চোখে এত রাগ সে কখনও দেখেনি। দুলুর গালাগালি শুনে বুবু কোনদিন কাঁদেনি। মাও তার উপর এত অসন্তুষ্ট কোনদিন হয়নি। কি এমন করল সে?...

বাবা তাকে মারতে যাচ্ছিল। মা বলল, থাম, ও জানে না। তারপর দুলুর হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। বলল, বস, কথা আছে। মায়ের মুখ খুব গম্ভীর। তার চোখ ছল ছল করছিল। মা আস্তে আস্তে বলতে লাগল, তোমার বয়স তখন দুই বছর ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমি হ্যারিকেন জ্বালচ্ছিলাম, তুমি বসে বসে হ্যারিকেন জ্বালানো দেখছিলে। তখন তোমার বুবু এসে বলল, আম্মা একটা মোরগ কম পড়ছে। আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার বুবুর সেই সময় দশ বছর বয়স, ক্লাস ফোরে পড়ত। অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমি বললাম, ভাইকে একটু খানিক

সামলাও, আমি নিলুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আমি চলে গেলে তুমি নাকি উঠানে মোরগটা দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে বুবু নেমে গিয়ে খোয়াড়টা খুলে দিল। হঠাৎ তোমার আর্ত চিৎকার শুনতে পেল, দেখল রান্নাঘরে আগুন। আগুনটা আসলে রান্নাঘরে নয়, তোমার গায়ের কাপড় জ্বলছিল, হ্যারিকেন থেকে কেরোসিন পড়ে গিয়ে আগুন ধরেছিল। তুমি জ্বলছিলে একটা মশালের মত।

মা আর কথা বলতে পারছিল না। বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছিল। দুলু জিজ্ঞাসা করল, তারপর?...

মা নিজেকে সামলে নিল। বলল, ঐ দেখ, পুকুর এখান থেকে কত দূর? তোমার বুবু খালি হাতে তোমাকে তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পুকুরে ঝাপ দিল। সেই জন্য তুমি এখনও বেঁচে আছ...

দুলু অনেক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে রান্না ঘর থেকে বের হল। বুবু তখন কুলা দিয়ে ডাল ঝাড়ছিল। দুলু তার সামনে এসে মুখ খুলতে পারলনা। হঠাৎ সে বুবুর গলা জড়িয়ে ধরল। ডালশুদ্ধ কুলাটা পড়ে গেল। তার জন্য কেউ তাকে বকতে এল না...।

৪৮২। আব্বার মিথ্যা কথা

খালেকদের বাড়িতে একটি মাত্র কাঁঠাল গাছ। বৈশাখ মাসে মুছি ধরলে চার ভাইবোন কয়টা কাঁঠাল হবে গুনতে শুরু করে। কাঁঠালে পাক ধরলে তারা একটা খায় আর গুনে কয়টা বাকি রইল।

একদিন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হচ্ছিল। খেয়ে-দেয়ে সবাই শুতে গিয়েছিল, কেবল মা জেগে নামাজ পড়ছিল। কিন্তু নামাজ পড়লে কি হয়, রাত্রে তার নজর বিড়ালের মত। হঠাৎ বাবাকে ডাকল, ওগো ওঠো। কাঁঠাল গাছে লোক উঠেছে! তখন কে যেন গাছ থেকে লাফ দিয়ে দৌঁড় মারল। বাবা তার পিছনে দৌঁড়াল, তবে অন্ধকারে কোন্ পথ দিয়ে গেছে তা বুঝতে পারল না। গাছের তলে একটা ছাতা দেখে নিয়ে এল। চোরের ভাগ্য খারাপ। সে পথ দিয়ে আসছিল ইন্দ্র জেলে। সে আব্বাকে বলল, লালুর ছেলে একটা কাঁঠাল নিয়ে গেল, তুমি দিয়েছ নাকি? আব্বা বলল, তা দিয়েছি বৈকি, তবে... সে ছাতাটা ফেলে গেল যে...

পরের দিন আব্বা লালুকে ছাতা দিয়ে এল। বলল, নাও, তোমার ছেলে এটা কাঁঠাল গাছের তলে ফেলে গেছে। লালু বলল, কাঁঠালটা ফিরিয়ে দিতে বলেছি। মাফ করে দাও ভাই, এ বৎসর আমার যা অভাব..... কাঁঠালের মৌসুম

শেষ হতে চলল, বাড়িতে একটা কাঁঠালও পড়েনি। ছেলেটা লোভ সামলাতে পারেনি।

আব্বা বলল, না না! সে কি! আমিই কাঁঠাল দিয়েছিলাম, ও বলেনি? দুদিন পর বেছে বেছে আর একটা পাঠিয়ে দেব, কি বল?...

লালুর হঠাৎ গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলিয়ে বলল, বস ভাই। তামাক খেয়ে যাও। তোমার মত মানুষ এখনও এ জগতে আছে বলে, সেজন্য বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হয়।

তার মারাত্মক ধনুক বার করল। সেই ধনুক সবাই চিনত। তার ধনুকের মত কোন ধনুক নেই। রাজা এক এক করে তিনজন মাস্তানকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করে ফেলল। বাকি সকলকে চাকরদের দিয়ে জাহাজে উঠিয়ে দিল। যে দ্বীপে নিজে দশ বছর কাটিয়েছিল সেখানে তাদের নির্বাসিত করল। দেশে ন্যায়, শান্তি ফিরে এল এবং সবাই রাজা ফিরে আসার আনন্দে মেতে উঠল।

৪৮৩। দশ বছর পরে

এক রাজা ছিল, খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান। প্রজারা তাকে ভালবাসত, কারণ সে দিন রাত তাদের মঙ্গলের কথা ভাবত। একদিন রাণী ও দশ বছরের রাজপুত্র সমুদ্রের তীরে তাকে বিদায় দিল। রাজা জলদস্যু দমন করার জন্য রওনা হল।

তিন দিনের দিন হঠাৎ ঝড়-তুফান শুরু হল। রাজার জাহাজ সাগরের মাঝে এক ডুবো পাহাড়ের এলাকায় এসে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। নাবিক ও সৈন্যদের কেউ বাঁচলো না, শুধু রাজা তার অসাধারন শক্তি ও দক্ষতার জোরে সাঁতার কেটে এক ছোট দ্বীপে পৌঁছে গেল।

সে দ্বীপে কোন মানুষ ছিল না। সেখানে রাজা অতি কষ্টে দশ বছর কাটিয়ে দিল। তারপর একদিন এক জাহাজ সেই পথ দিয়ে এল। রাজা জাহাজে উঠে কুলির কাজ করতে করতে দেশে ফিরে গেল। কেউ তাকে চিনতে পারল না। ফেরার পথে সে অনেক খবর পেল। দেশে সবাই মনে করে রাজা মারা গেছে। সব মন্ত্রীরা ও বড় লোকেরা রাণীকে বিয়ে করে রাজা হতে চায়। রাণী নাকি তাদের সামলাবার জন্য বলেছে বিয়ের পোশাক নিজেই না বুনা পর্যন্ত বিয়ে করবে না। সবাই সন্দেহ

করে যে, দিনের বেলা সে যে কাপড়টা বুনে, রাতে সেটা কেটে ফেলে। ছেলেটার বয়স এখনো বিশ বছর হয়নি। চালাক মন্ত্রীদের সঙ্গে সে বুদ্ধিতে পেরে ওঠে না। বর্তমানে রাজ্যের দেখাশুনা আর কেউ করে না। জোর যার মুলুক তার, এই আইন ছাড়া দেশে আর কোন আইন নেই।

জাহাজ থেকে নেমে রাজা ভিক্ষুক সেজে রাজপ্রাসাদে ভিক্ষা করতে গেল। সেখানে এসে দেখল প্রধান মন্ত্রী তার বন্ধুদের দাওয়াত করে খাইয়ে-দাইয়ে রাজ্যের সম্পদ উড়িয়ে দিচ্ছে।

এক সময় রাণী ভিক্ষুকের চেহারা দেখে আশ্চর্য হল... রাজপুত্রকে

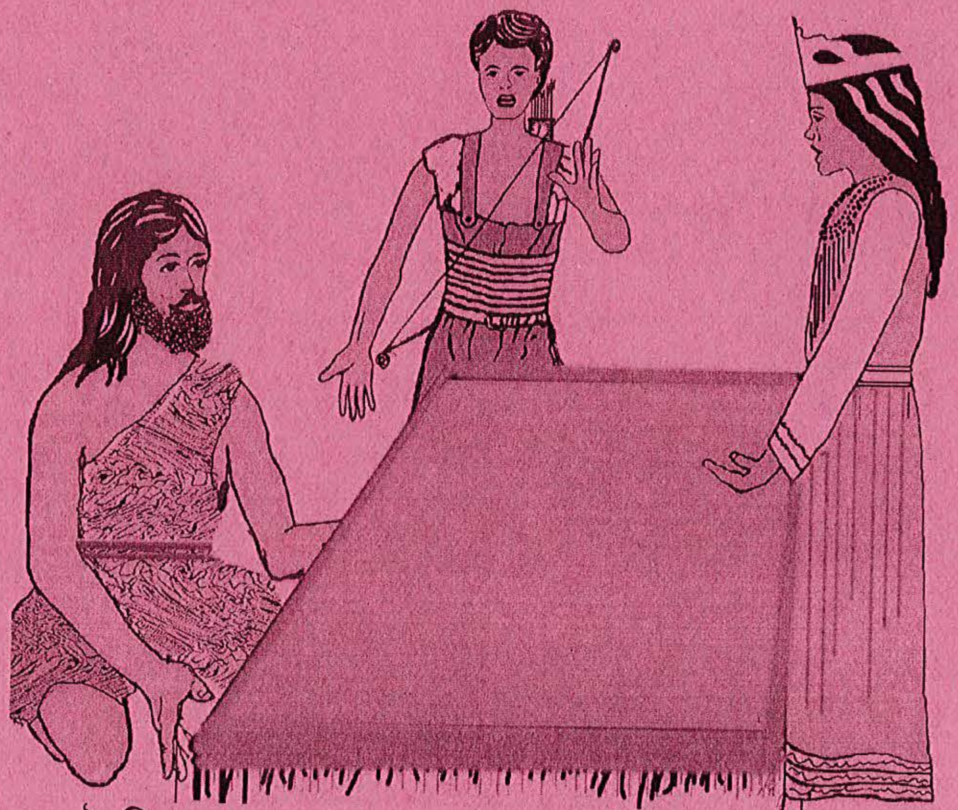

বলল, ঐ ভিক্ষুককে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস তো!

রাণী ভিক্ষুকটিকে বলল, তোমার গায়ে জোর আছে দেখছি, দয়া করে আমার এই বড় খাট জানালার দিকে সরিয়ে আন।

খাটটা ছিল রাজা-রাণীর খাট। রাজা নিজেই সেই খাট তৈরী করেছিল। তার একটা পায়া ছিল হাঁটু সমান কাটা একটা বড় গাছের গুড়ি। গাছটার শিকড় এখনো মাটির তলে। সে কথা রাজা ও রাণী ছাড়া আর কেউ জানত না। রাজা হেসে বলল,

- অসম্ভব কাজ করতে বলছ কেন রানী?

রাণীর সন্দেহ কেটে গেল। তাকে আলিঙ্গন করে মনের আনন্দে চোখের পানি ফেলতে লাগল। রাজা তার ছেলেকে বলল,

- যারা দেশের সম্পদ উড়িয়ে দিচ্ছে সে সব মন্ত্রী ও বড় লোকদের আজ রাত্রে দাওয়াত কর। সবাই যেন আসে। রাণী তার স্বামীকে বেছে নেবেন, এ কথা ঘোষনা কর। আমার ধনুক ও তীর প্রস্তুত করে রাখ। তুমি বল্লব নিয়ে তৈরী হও। তোমার সাহায্য ছাড়া কারও সাহায্য নেব না।

রাত্রে ভোজের পর যখন মদ খেয়ে সবাই মাতাল হয়ে গেল, তখন রাজা বাইরে থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিল। তারপরে

৪৮৪। কাজের আনন্দ

সালাম ঢাকাতে এক মন্ত্রী সাহেবের বাসায় চাকরি করে। মন্ত্রী সাহেবের রয়েছে বড় এক বাগান। অতিথীরা দেশ বিদেশ থেকে আসে, বাগানে বসে মন্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করে ও বাগান দেখে মুগ্ধ হয়। বাংলাদেশে নাকি এর মত আকর্ষণীয় বাগান তারা আর দেখেনি।

এই দশ বছর ধরে সালাম এই বাগান দেখাশুনা করছে। দল পাল্টায়, মন্ত্রীরা পাল্টায়। সবাই কিন্তু সালামের সাথে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব রাখে। তার মত মালী পেয়ে তারা ধন্য।

এবার কিন্তু যে নতুন মন্ত্রী এল, সে অন্য রকম। মানুষের দিকে চেয়ে দেখবার সময় তার নেই।

এই মাসে বর্ষা পুরোপুরি এসে গেছে। বিরাট বাগানে ঘাস এত দ্রুত বেড়ে উঠেছে যে, সালাম ছেঁটে শেষ করতে পারছে না। বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে তার মন ভীষণ খারাপ। কাল রাতে ছোট ভাইকে বলেছে, আগামী কাল এস, গরু-ছাগলের জন্য ঘাস কেটে নিয়ে যেও। তাতে আমার সুবিধা হবে।ছোট ভাই কিন্তু সাধারণ কাপড় পরে

এসে কাজ করতে লাগল। তার ইউনিফর্ম নেই। হঠাৎ মন্ত্রী সাহেব এসে সালামকে বলে ফেলল- এই শূয়োরের বাচ্চা এখানে এল কোথা থেকে ? সালামের হাতে যে কাস্তে ছিল তা মাটিতে পড়ে গেল।

সে তার ভাইকে বলল- চলে

এস। তার ইউনিফর্ম খুলে এক গাছের ডালে ঝুলিয়ে সালাম তার ছোট ভাইকে নিয়ে চলে গেল। রাত্রে মন্ত্রী সাহেবের বাড়ির ম্যানেজার নিজেই সালামের কাছে এল। তার হাত ধরে বলল- ভাই ফিরে আসতে হবে, মন্ত্রী সাহেব নিজেই আমাকে পাঠিয়েছেন। বললেন যে, তার ভুল হয়ে গেছে।

সালাম অনেক্ষণ চুপ করে রইল। ম্যানেজার সাহেবকে চা খাওয়াল, নাস্তা খাওয়াল, তারপর বলল, মন্ত্রী সাহেব যখন তার ভুল স্বীকার করেছেন তখন তার উপর আমার কোন রাগ নেই। কিন্তু তার কাজ আমি আর করতে পারবনা। ম্যানেজার বলল, এত সুন্দর চাকরি আর কোথায় পাবে? যেখানেই যাও, এই মাইনা আর কেউ দেবেনা।

সালাম বলল, তা জানি। তবে শুধু টাকায় মানুষ বাঁচেনা। কাজের মধ্যে যদি আনন্দ না পাই তাহলে টাকা নিয়ে আমার কি লাভ ? আগে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, তাই কাজের মধ্যে আনন্দ ছিল। এখন শ্রদ্ধাও গেল, আনন্দও গেল। শুধু টাকার জন্য আমি কাজ করতে পারব না। টাকার চেয়ে আমার জীবনের দাম বেশী।

৪৮৫ মহানবী ও দুষ্ট বুড়ি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কেবল ইসলাম প্রচার শুরু করেছেন। চারদিকে বিভিন্ন সমস্যা। কেউ তাকে সাহায্য করেনা, বরং পদে পদে তাঁকে বিপদে ফেলে। সেই সময় খুব ভোরে মহানবী মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। তিনি যে পথ দিয়ে যেতেন সেই পথে প্রতি দিন এক বুড়ি কাঁটা ছড়িয়ে দিত, যাতে মহানবী কষ্ট পায়। কাঁটা বিঁধে মহানবী

কষ্টই তো পেতেন আর বুড়ি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখত আর ফোকলা দাঁতে ফিক ফিক করে হাসত। তবু মহানবী কিছুই বলতেন না, নীরবে কাঁটা সরিয়ে পথ চলতেন। বুড়ি ভাবত, কি অদ্ভুত লোক রে বাবা! রোজ রোজ তার পায়ে কাঁটা বিঁধে তবু সে একটুও গাল দেয় না।

এভাবে দিন যায়, বুড়ি কাঁটা পুঁতে রাখে আর মহানবী সে কাঁটা হাসিমুখে সরিয়ে ফেলেন। কিনতু একদিন মহানবী পথে কোন কাঁটা পেলেন না। তিনি এদিক ওদিক চেয়ে কোথাও বুড়িকে দেখতে পেলেন না। তখন ভাবলেন, হয়ত বুড়ির অসুখ করেছে, তাকে দেখবার কেউ নেই। তিনি বুড়ির বাড়িতে গেলেন। বুড়ি মহানবীকে দেখে তো অবাক। মহানবী বুড়ির সেবায় লেগে গেলেন। বুড়ি নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ভাবল, মহানবী কত উদার, কত মহান। বলা বাহুল্য তারপর থেকে মহানবী মসজিদে যাওয়ার পথে আর কাঁটা পেলেন না।

৪৮৬ দরদী বন্ধু

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক। তিনি সাধারণ প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য রাতের বেলায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। এক রাতে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে হাযার নামক জায়গায় চলে গেলেন। এক সময় তিনি কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কান্নার উৎস খুঁজতে খুঁজতে তিনি একটি কুটিরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন কুটিরের ভিতরে এক মহিলা রান্না করছে। তার পাশে তিন চারটি শিশু অনবরত কেঁদেই চলেছে। তিনি কুটিরের ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কাদছে কেন? মহিলাটি বলল, ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। আমি তাদের কান্না থামানোর জন্য খালি হাড়ি চুলায় চড়িয়ে দিয়েছি। হযরত উমর (রা) দেরি না করে মদিনায় ফিরে গেলেন। আটা, ঘি, গোশ্‌ত, ছাতু ও খেঁজুর নিয়ে আবার ঐ কুটিরে ফিরে গেলেন। ভৃত্য বলল, হুজুর ওগুলো আমার হাতে

দিন, আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমার কাজ আমাকে করতে দাও। কেয়ামতের দিন তো তুমি আমার বোঝা বহন করবে না। এই বলে তিনি নিজেই বোঝা মাথায় করে মহিলার কাছে ফিরে এলেন। মহিলাটি এবার রান্না করল। হযরত উমর (রা) বার বার চুলায় ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন। খাবার তৈরি হল। শিশুরা পেট ভরে খেয়ে খেলা করতে লাগল। হযরত উমরের মন আনন্দে ভরে গেল।

মহিলাটি অল্পক্ষণ পরেই যখন লোকটির পরিচয় জানতে পারল তখন অবাক হয়ে বলতে লাগল, এ কেমন মহানুভবতা! মুসলিম জাহানের খলিফা উমর (রাঃ) আমার দুঃখ কষ্টের শরীক হতে আসবেন, এমন কথা কেউ ভাবতে পারত না। তিনি শুধু বাদশাহ্‌ নন, তিনি আমাদের বন্ধু।

৪৮৭ মায়ের খেদমত

গভীর রাত। বায়েজিদের মা ঘুমিয়ে আছেন। বায়েজিদ পড়াশোনা করে শুতে এসেছেন। ছেলের সাড়া পেয়ে মা জেগে উঠলেন। জেগেই বললেন, বাবা, পানি খাব।

বায়েজিদ দেখলেন ঘরের কলসিতে এক ফোঁটা পানিও নেই। শীতের রাত, তার উপর পানি আনতে বহু দূরে যেতে হবে। বায়েজিদ কলসটি হাতে করে পানি আনতে গেলেন। পানি এনে দেখলেন, মা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার অসুবিধা হবে ভেবে মাকে জাগালেন না। তিনি পানির গ্লাস হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, মা আবার জেগে পানি চাবেন, তখন পানি দেবেন, এই আশায়। অনেক্ষন

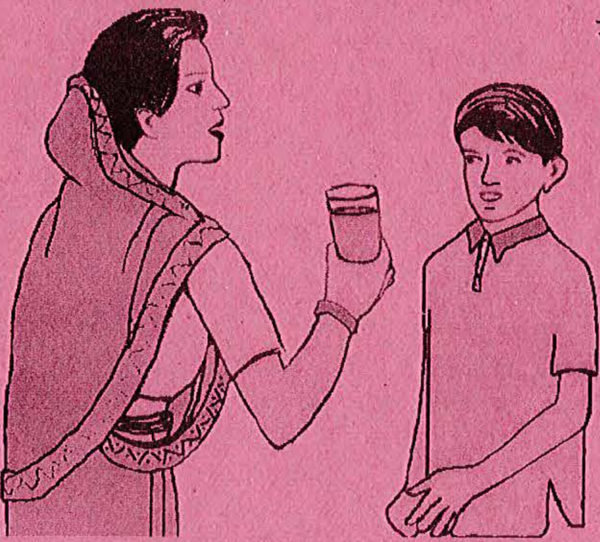

বায়েজিদ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে ফজরের আযান শোনা গেল। মা নামাজ পড়ার জন্য উঠতে গিয়ে দেখেন, বায়েজিদ পানির গ্লাস হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে মা পানি পান করলেন। শেষে তাকে দোয়া করলেন, হে দয়াময়, বায়েজিদ যেমন আজ আমার খেদমত করল, তার চেয়েও বেশি যেন তোমার খেদমত করতে পারে। মায়ের এ দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন। বায়েজিদ পরে একজন কামেল দরবেশ হয়ে গেলেন।

৪৮৮। বাবার গুপ্ত ধন

এক ধনী কৃষক ছিল। সে কৃষি কাজের সকল কৌশল জানত। কিনতু তার তিন ছেলের কেউ কাজ করত না. শুধু খেত, ঘুমাত ও বাবার সম্পদের মালিক হওয়ার আশায় বসে থাকত। কৃষক তাদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল। তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে এমন সময় ছেলেদের ডেকে বলল, শোন। আমার ধন সম্পদ জমিতে মাটির তলে রয়েছে। খুঁজলে পেয়ে যাবে। বাবা মারা যাবার পর ছেলেরা লুকানো ধন সম্পদ পাবার আশায় সব জমিটা খুঁড়ে একাকার করল তবে যথাসাধ্য খুঁড়াখুঁড়ি করেও কোন ধন সম্পদ পেল না। তারা হতাশ হলো। শেষে ভাবল, জমি যখন এত খুঁড়াখুঁড়ি হলো তখন কিছু বীজ বুনে দেয়া যাক। তবে এত খুঁড়াখুঁড়ির ফলে তারা জমি থেকে প্রচুর ফসল পেল। এই ভাবে তারা বাবার সম্পদ পেয়ে গেল, শুধু তাই নয়, তারা শিখল যে পরিশ্রম ছাড়া ফল জোটে না। বাবা ঠিক তাই চেয়েছিল।

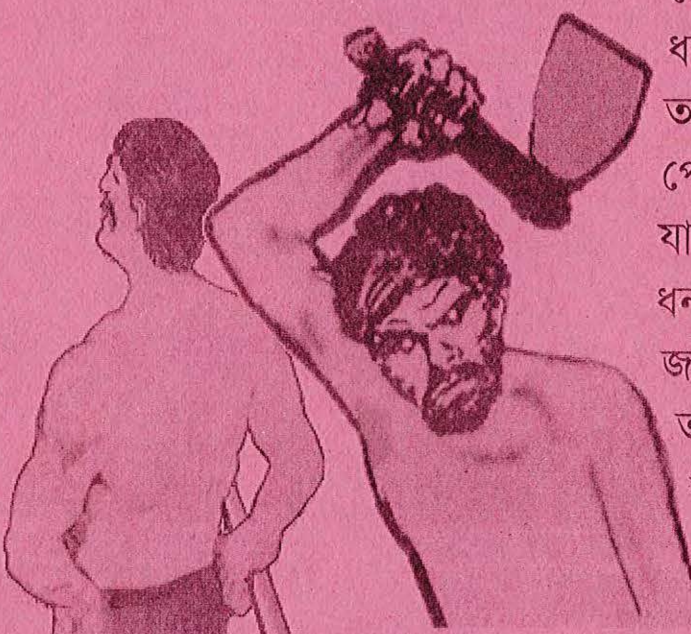

৪৮৯। মিথ্যার ফল

রাজপথ। সে পথে শত শত লোক চলাফেরা করছে। কত গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে। এ রাজপথ দিয়েই হাঁটছিলেন এক ফকির। ঝাকড়া চুল। পরনে ছেঁড়াফাড়া লুঙ্গি আর গায়ে শত তালির জামা । ফকির নিজের মনে হেঁটেই চলেছেন আর কি যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছেন। তার পাশ দিয়ে হরেক রকম গাড়ি ঘোড়া চলছে সে দিকে কোন খেয়াল নেই। ঠিক সে মুহূর্তে ফকিরের পাশ দিয়ে গেল একটা গরুরগাড়ি। গাড়িতে কয়েকটি বস্তা। ফকির জিজ্ঞেস করলেন, বস্তার মধ্যে কি? গাড়িওয়ালা ভাবল, কি আপদ! না জানি ফকিরের মনে কি মতলব আছে, না জানি কি ঝামেলা বাধায়। এ সব ভেবে ফকিরকে বলল, ছাই আছে। ফকির বললেন, 'তবে তাই হোক'। তারপর ফকির আপন পথে চলে গেলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় গাড়িওয়ালা বাড়িতে পৌছল। বাড়িতে পৌঁছেই গাড়িওয়ালার মাথায় হাত। এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে। গাড়ির বস্তাগুলোতে ছিল চিনি। বস্তাগুলোর মুখ খুলে দেখল তার ভিতরে চিনির বদলে শুধু ছাই। তখন গাড়িওয়ালার অবস্থা বেগতিক। সে বুঝে ফেলল, এটা ফকিরের কেরামতি। সে বের হলো ফকিরের খোঁজে। উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক খুঁজে ভিড়ের মধ্যে তাকে পেল। গাড়িওয়ালা তার পা জড়িয়ে ধরল, ফকিরের কাছে মাফ চাইল। ফকির মুচকি হেসে বললেন, আর কখনও মিথ্যে বলো না। মিথ্যে সব সময়ই বিপদ ডেকে আনে। যাও, তোমার জিনিস তুমি ফেরত পাবে। গাড়িওয়ালা বাড়িতে এসে দেখে সত্যি সত্যি বস্তার ছাইগুলো চিনি হয়ে গেছে। সেদিন থেকে গাড়িওয়ালা আর কখনও মিথ্যে বলে নি।

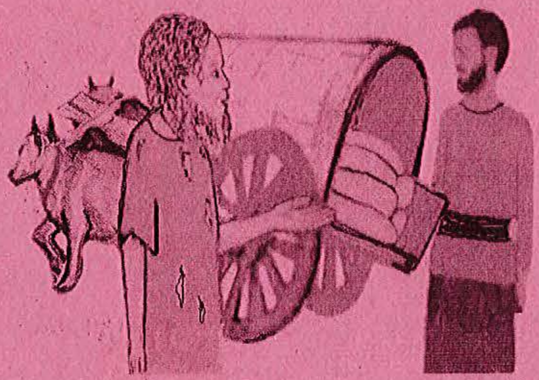

এ ফকির ছিলেন হযরত শেখ ফরিদ।

৪৯০। সুন্দর কাকে বলে

মিসর দেশে এক লোক বাস করত। লোকটি ছিল যেমনই ধনী তেমনই সৎ। লোকটির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। ছেলেটির নাম হৃদয়, মেয়েটির নাম ঝুনু। ছেলেটি ফুটফুটে ফর্সা, মেয়েটি তত ফর্সা না হলেও অসুন্দর নয়। তাদের বাড়িতে কোন আয়না ছিল না। বাবা যেদিন আয়না কিনে নিয়ে এল বাড়ির সকলেই সেদিন খুশি হল। সবচেয়ে খুশি হলো ছেলেটি। আয়নায় নিজের মুখ দেখে বলে উঠল, আহ! আমি দেখতে কি সুন্দর! বোনটির দিকে তাকিয়ে বলল, তোর চেয়ে আমি কত সুন্দর দেখ! ভাইয়ের এ কথা শুনে বোনের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। তার খুব রাগ হলো । সে ভাইকে ধাক্কা দিয়ে বলল, দূর হয়ে যা তুই আমার সামনে থেকে।

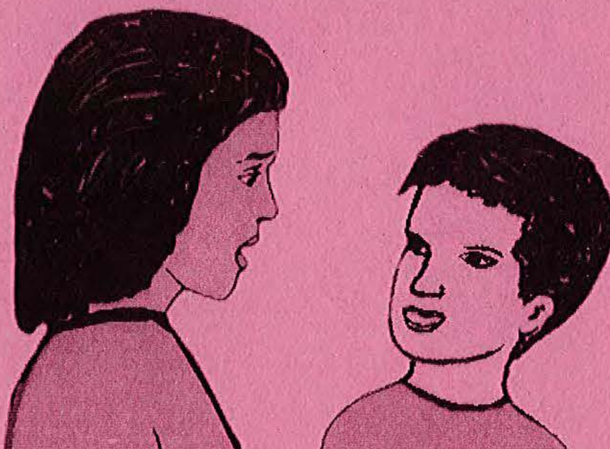

হৃদয় ও ঝুনুর বাবা পাশের ঘরেই ছিল। সে দু'জনের কথা শুনল। হৃদয়কে বলল, তুমি যে দেখতে সুন্দর তাতে তোমার দাম বাড়ছে না বাবা, বরং তোমার বোনের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলে তোমার দাম বাড়ত। আর ঝুনুকে বলল, তুমি যে ভাইয়ের মত ফর্সা নও তাতে তোমার দাম কমছে না মা। তোমার ভাইয়ের অভদ্রতা হাসি মুখে সহ্য করতে পার না বলে তোমার দাম কমে যাচ্ছে। কেমন করে পরের ভালবাসা আদায় করতে হয় তোমরা তা এখনও শিখতে পারলে না।

৪৯১। কাক ও কলসি

গরম কাল। মাটি ফেটে চৌচির। একটা কাক সকাল থেকে রোদে ঘুরছিল, ফলে তার খুব পিপাসা পেল। কাঠফাটা রোদে কাকটি কোথাও পানি পাচ্ছিল না। পিপাসায় ছটফট করছিল। তার অবস্থা কাহিল।

হঠাৎ একটা পানির কলসি দেখতে পেল। কোনমতে সেখানে উড়ে গেল। পানি খাওয়ার জন্য কলসির ভিতর ঠোঁট ঢুকাল। কিন্তু তার ঠোঁট পানির নাগাল পেল না, কেননা কলসিতে যথেষ্ট পানি ছিল না। কাকটি ভাবতে বসল। কি করা যায়। এ দিকে পিপাসায় তার অবস্থা মরো মরো। অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল কলসির আশে পাশে নুড়ি পড়ে আছে। তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। একটা একটা করে নুড়ি তুলে কলসির ভিতর ফেলতে লাগল। ফলে আস্তে আস্তে কলসির পানি উপরে উঠে আসতে থাকল। এক সময় কাক পানির নাগাল পেয়ে গেল। সে তখন অনায়াসে পানি খেয়ে পিপাসা দূর করল। এবার কাকটি কিছুক্ষন বিশ্রাম করে সতেজ হলো। তারপর আনন্দে নাচতে নাচতে আকাশে উড়ে গেল।

৪৯২। লোভের শাস্তি।

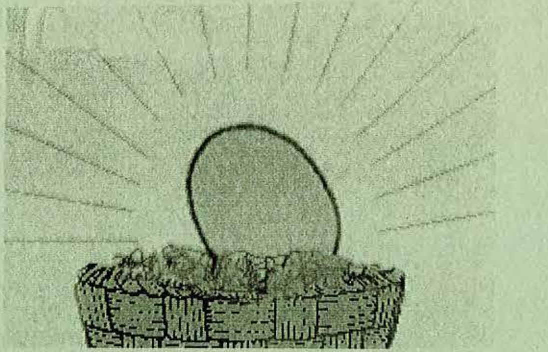

এক চাষী ছিল। তার ছিল একটি রাজহাঁস। সে হাঁসটির আচরণ অবাক করার মত, প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম পাড়তো। চাষীটি সে ডিম বিক্রি করে ভাল পয়সা পেত।

রোজ একটা করে সোনার ডিম পেয়ে লোকটির লোভ বেড়ে গেল। তার আর তর সইছিল না। একটা সোনার ডিম পেতে চব্বিশ ঘন্টা দেরি! সে ভাবল প্রতিদিন একটা করে সোনার ডিম পাওয়ার চেয়ে একসাথে সবগুলো পাওয়া অনেক ভাল। চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করার কোনই দরকার নেই। হাঁসটা যখন প্রত্যেক দিন একটা সোনার ডিম পাড়ে তখন নিশ্চয়ই ওর ভিতরে অনেক সোনার ডিম জমা আছে। হাঁসটার

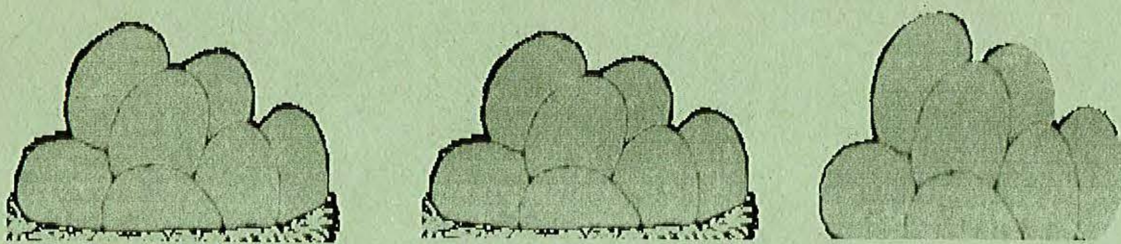

পেট চিরে সব সোনার ডিম একসাথে নেয়া যাক। যেই ভাবা সেই কাজ। লোকটি হাঁসটিকে মেরে তার পেট কেটে ফেলল। কেটে দেখল হাঁসটির ভিতরে রক্তমাংস, কলিজা, গিলা আর নাড়িভুঁড়ির দলা ছাড়া কিছুই নেই। লোকটি হায়! হায়! করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এতদিন একটা করে সোনার ডিম পেয়েছিল। এখন তার বোকামি ও তার লোভের কারণে সব বন্ধ হয়ে গেল।

৪৯৪। ভরত পাখি ও তার বাচ্চারা

এক যে ছিল ভরত পাখি। এক সময় তার ডিম পাড়ার সময় হলো। বেছে বেছে এক গমের ক্ষেতে সে ডিম পাড়ল। যথা মসয়ে সেই ডিম থেকে বাচ্চাও বেরুল। বাচ্চাগুলো বেশ বড়ও হয়েছে, মাথায় ঝুঁটি বেরিয়েছে। একদিন সেই ক্ষেতের মালিক ক্ষেত পরিদর্শনে এল। এসে দেখল, গমগুলো বেশ পেকেছে। এবার তা কেটে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। বলল, যাই বন্ধুবান্ধবদের ডেকে নিয়ে আসি। ক্ষেত মালিকের কথা ভরত পাখির একটা বাচ্চার কানে গেল। সে ভয় পেল। তার মাকে ডেকে বলল, ওমা, শুনলে তো, ক্ষেত মালিক কি বলে গেল? চল চল আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। মা পাখিটি হেসে বলল, সে হবে খন। কোন তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।

এর কয়েকদিন পর আবার ক্ষেত মালিক এল সেই ক্ষেত দেখতে। সে দিন তার সাথে তার দুটি জোয়ান ছেলেও ছিল। ক্ষেতের অবস্থা দেখে সে তার ছেলেদের বলল, দেখেছিস, গম ঝরে ঝরে পড়ছে। আর তো রাখা যায় না। বন্ধুদের ডাকলাম, কেউই তো এল না। কাল তোদের দু'জনকে নিয়ে আমি নিজে গম কাটতে লেগে যাব।

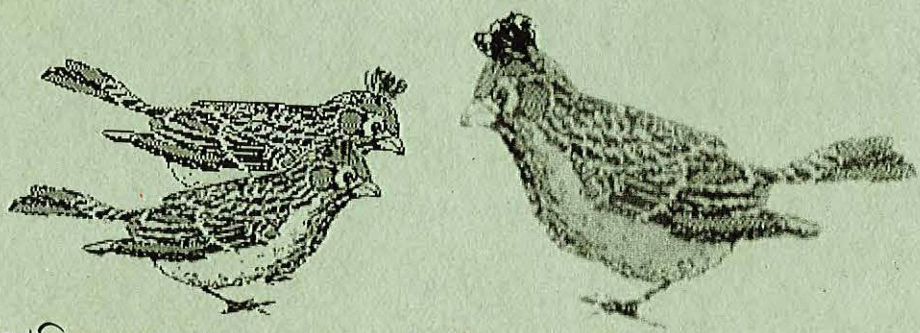

ক্ষেত মালিকের কথা শুনে মা পাখিটি বলল, হ্যাঁ, এবার আর আমাদের এখানে থাকা চলবে না । ও যখন নিজের কাজ নিজেই করতে চাইছে তখন কাজটা না হয়ে পারে না। আজ রাতের মধ্যেই আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

৪৯৩। পিঁপড়ে ও ঘাস ফড়িং

এক বনে এক পিঁপড়ে আর এক ঘাস ফড়িং ছিল। তাদের স্বভাব বিপরীত। পিঁপড়ে সারাটা বসন্ত কাল ছুটাছুটি করে বর্ষাকালের জন্য শস্যের দানা এনে তার বাসায় জমাত। ভাবত, আমরা তো অনেক, আমাদের বাঁচতে তো হবে, উপরন্ত উদাসিন, বোকা, পঙ্গু প্রতিবেশীর সংখ্যাও কম নয়। বিপদের সময় তাদের বাঁচাবে কে? এদিকে ঘাস ফড়িং বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া খেয়ে ফুর্তি করত এবং তাইরে নাইরে করে নাচত। পিঁপড়েকে এত পরিশ্রম করতে দেখে সাহায্য করা তো দূরের কথা, উপহাস করে বলত, তুমি কি বোকা রে বাবা। আরামের

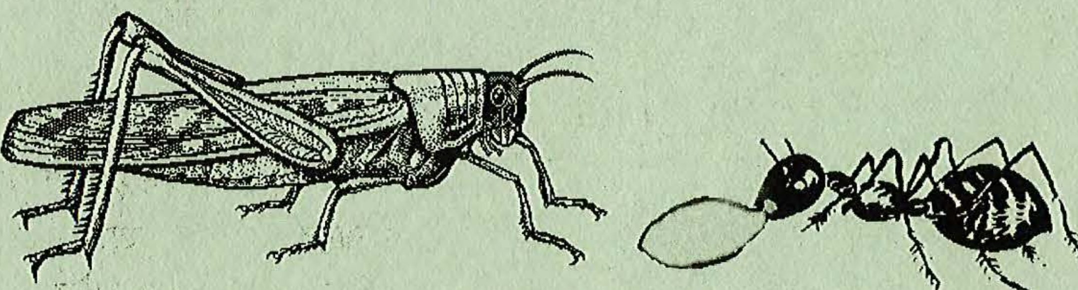

দিনে আনন্দ করবে, তা না, তুমি খেটে খেটে মরছ। কিনতু বসন্তকাল গিয়ে ধীরে ধীরে বর্ষাকাল এল। তখন শুধু বৃষ্টি, আর চারদিকে থৈ থৈ পানি। ঘাস ফড়িং খাবারের খোঁজে বেরুতে পারে না। অনেক দিন খেতে না পেয়ে কাহিল হয়ে গেল, চলাফেরাও করতে পারছিল না। একদিন সে ক্ষুধার জ্বালায় পিঁপড়ের স্বরণাপন্ন হল। বলল, ভাই, তোমার জমানো খাবার থেকে আমাকে কিছু দাও। আমি যে ক্ষিধের জ্বালায় মরতে বসেছি। পিঁপড়ে বলল, যখন আমাকে উপহাস করছিলে তখন সে কথা ভাবলে না কেন? তখন না ছিল শীত, না ছিল বৃষ্টি, আমার মত কেন খাবার যোগাড় করে রাখনি? আর আমাকে সাহায্য করনি কেন? ঘাস ফড়িংটা বলল, তখন যে আনন্দের সময়, আমি ধেই ধেই করে নাচতাম। পিঁপড়ে নিষ্টুর ভাবে হেসে বলল, বেশ তো, বসন্ত কালে ধেই ধেই করে নাচতে , এখন ধেই ধেই করে গান কর।